বিচিত্র ভ্রমণ

শ্রীকৃষ্ণলাল বসাক প্রণীত

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১৩২৮

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীকৃষ্ণলাল বসাক
৫৫নং আহেরিটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন।

আমি আমার কর্ম্মের অবসরে যখনই কলিকাতায় আসিয়াছি অনেকেই আমার নিকট আমার বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী শুনিতে চাহিয়াছেন। কেহ কেহ তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতেও বলিয়াছেন। এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। প্রথম কারণ, তেমন অবসর পাই নাই। দ্বিতীয় কারণ, বুঝিতে পারিতাম না আমার ভ্রমণকাহিনীতে লোকের কি আনন্দলাভ হইবে। কিন্তু আজকাল অবসর থাকাতে ও বন্ধুবান্ধবের ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে উপরোধে বুঝিলাম যথাসম্ভব অল্প কথায় আমার ভ্রমণ-কাহিনী চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। হইয়াছে কি না তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

বলা বাহুল্য আমি আমার জীবনকাহিনী লিখিতে বসি নাই বা লোকশিক্ষার্থ এ কার্য্যে উদ্যোগী হই নাই। তবে আমার এই বয়সের অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে পাসকরা লেখাপড়া না শিখিয়া আমার জীবনপথের গতি যে অন্য পথে গিয়াছিল তাহাতে আমি এমন কিছু উন্মার্গগামী হইয়া পড়ি নাই। অর্থোপার্জ্জনের পক্ষেও যে তেমন কিছু অসুবিধা হইয়াছিল তাহা ত বলিতে পারিই না বরং আমি কলিকাতায় কোনও কার্য্য করিয়া এ প্রকারে আমার পরিবার পরিজন প্রতিপালনে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ। আমি জীবনে পৃথিবীর নানা সভ্য জাতির সংস্রবে আসিয়া তাহাদেরই আনুকূল্যে সহকারিতায় ও সাহচর্য্যে আমার ন্যায্য প্রাপ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের সহিত বিরোধ

করিয়া এ লাভ করিতে হয় নাই কিম্বা আমার লাভে তাঁহারাও কেহ আমার সহিত কোনও বিরোধ করেন নাই। বিরাট বসুন্ধরার বক্ষে সকলেরই ন্যায্যগণ্ডা দিতে ত্রুটী না করিলে বাঙ্গালীর ছেলেও পাঁচজনের একজন হইয়া জীবন কাটাইতে পারে এ বিশ্বাস আমি কখনও হারাই নাই এবং আশাকরি বাঙ্গালী মাত্রই সে বিশ্বাসে কাজ করিলে সকলেই আমার মতন সফলতা লাভ করিতে পারেন। আমার এই ভ্রমণকাহিনী পড়িয়া যদি কোন আনন্দ লাভ করেন তবে উল্লিখিত কয়টী কথাও বোধ হয় আপনাদের মনে আপনাআপনিই জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলেই আমার ভ্রমণ-কহিনী লিপিবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ হইল। ইতি—

সন ১৩২৬ সাল।

1919 A.D.

নিবেদক—

শ্রীকৃষ্ণলাল বসাক।



Yours Truly

K. Bysack.

Mohila Press, Cal.

বিচিত্র ভ্রমণ

(কৃষ্ণ বসাকের আত্মকথা)

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

আমি কলিকাতার বসাকবংশের ছেলে। বাঙ্গলাদেশের অনেকেই জানেন সপ্তগ্রাম হইতে দুইঘর শেঠ ও চারি ঘর বসাক গোবিন্দপুরে ব্যবসায়ের জন্ত উঠিয়া আসেন। গোবিন্দপুর তখন বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এই গোবিন্দপুরে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃতি করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই শেঠ-বসাকরাই প্রথমে ঐ সকল বিদেশী বণিকদিগের বাণিজ্যবিস্তৃতির সহায়তা করেন। ইতিহাসে যে সকল দাদনি বণিকদিগের কথা শুনা যায়, যাঁহাদের সাহায্যে ইউরোপের বণিক সম্প্রদায় এই সুদূর এসিয়ায় আপনাদের বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, কলিকাতার শেঠ-বসাকরা সেই দাদনি বণিকদিগের অন্ততম।

৺শোভারাম বসাক এই কয়ঘর বসাকদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিবান পুরুষ ছিলেন। তিনি কোম্পানীর আমলে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সন্ততিগণ কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে বসবাস করিতে

থাকেন। আমি এই ৺শোভারাম বসাকের বংশেরই একজন। ইংরাজী ১৮৬৬ সালে ২১এ এপ্রিল আমার জন্ম হয়।

আমার পিতামহ ৺রাধারমণ বসাক মহাশয় আমাদের আহীরীটোলার বাটী খরিদ করেন। আমার পিতা ৺চন্দ্রকুমার বসাক মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। আমার মাতাঠাকুরাণী গরাণহাটার সুপ্রসিদ্ধ ৺বৃন্দাবন বসাকের ঘরের দুহিতা। মনে পড়ে আমার শিশুকালে মাতুলালয়ে প্রসিদ্ধ যদু পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। কাজে কাজেই মাতুলালয়ে ঐ বঙ্গবিদ্যালয়েই আমার বিদ্যারম্ভ হয়।

বিদ্যারম্ভের পর ১ বৎসর না যাইতে যাইতেই আমার জীবন-পথের প্রথম দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মাতাঠাকুরাণী আমার ৭ বৎসর বয়সেই এক কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পিতাঠাকুর ও পিতামহীই আমাদের দেখা-শুনার ভার লইলেন। আমার বাল্যকালের কথা মনে হইলেই এখনও আমার সেই পিতামহীকেই মনে পড়ে।

স্কুল যাইতাম; কিন্তু ১০॥ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বাঁধাধরা বসিয়া থাকা, বসিয়া বসিয়া পড়া মুখস্থ করা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় কলের পুতুলটীর মতন নড়াচড়া, এসব আমার বড় ভাল লাগিত না। পড়া শুনিতাম কিন্তু তাহাতে আমার মন বসিত না। অন্যান্য বালকদের ন্যায় কোনও কিছু বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিতাম না। আমার মন খেলিবার জন্য ঘরের বাহির হইয়া বাহিরের উঠানে বা পাড়ার মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এই সময় মাতার মৃত্যুর প্রায় ১ বৎসর পরে আমাদের পাড়ার

এক বাড়ীতে ৺অখিল চন্দ্রের জিমন্যাষ্টিক হয়। রাত্রি ৯টার সময় খেলা আরম্ভ হয়। আমি ঐ খেলা দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক হই এবং রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ঐ খেলা দেখি। সেদিনকার ঐ খেলা আজও আমার বেশ মনে আছে। ঐ খেলার কৃতিত্ব আমার সমস্ত মন বশ করে। দেখার পর হইতে দিনরাত ঐ দৃশ্য চক্ষে লাগিয়া রহিল, মাথায় ক্রমাগত জাগিয়া রহিল ঐ জিমন্যাষ্টিক করিতেই হইবে। আমি ঠিক ঐরূপ করিতে পারিব।

এইরূপে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপন হইয়াছিল। আমার জীবনে যাহা কিছু করিয়াছি তাহার সবই সূচনা ঐ দিনে। কে যেন সে দিন আমার মনে মনে কানে কানে বলিয়া দিয়াছিল, ঐ পথের পথিক আমাকে হইতেই হইবে। ঐ লক্ষ্য ভেদ করিতেই আমি আসিয়াছি, ঐ কার্য্যের কৃতিত্বই আমার জীবনের সার্থকতা।

বাড়ী আসিয়া কি করিয়া ঐ শিক্ষা শিখিতে পারি, তাহার জন্য আমার মন উতলা হইয়া উঠিল। পড়াশুনা বড় হইত না কিন্তু তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতাম না। পিতাঠাকুর অনেক তিরস্কার করিতেন, মারধরও করিতেন, তাহাতেও বড় বিচলিত হই নাই। আমার ভবিতব্য তখন হইতেই আমার পথ ছকিয়া দিয়া গেল। আমার বিধাতা আমায় লইয়া যাহা গড়িবেন, তাহার মালমসলা তখন হইতেই তিনি আপনিই যোগাইতে লাগিলেন।

বাড়ীতে একগাছা বড় আবলুষ কাঠের রুল ছিল। তাহার একদিক দেওয়ালে লাগাইয়া অপর দিক একটা খাড়া বাঁশের উপর রাখিয়া আমার সেই শিক্ষানবিশী অবস্থার হরিজণ্টাল বার হইল। কিন্তু তাহাতে কি কিছু শেখা যায়? চেষ্টা করিতাম কিন্তু

কিছুই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আমার মন তখন অশান্ত হইয়া উঠিত।

সে সময়টাও আপনারা মনে রাখিবেন। তখন জিমন্যাষ্টিক করা ভাল ছেলের লক্ষণ ছিল না। পাড়ায় মুরুব্বিরা, স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিতরা এসব বিদ্যা চোয়াড়ে ছেলের বিদ্যা বলিতেন। শরীরের কসরৎ করা, কুস্তি করা, প্যারালাল বার বা হরিজন্টাল বারের খেলার শেখা তখন গুণ্ডামি বলিয়া পরিচিত হইত। গোবেচারা নিরীহ মুখচোরা ছেলেরাই তখন সচ্চরিত্রতার পারিতোষিক পাইত।

একে আমার পড়াশুনায় তত মন ছিল না। তাহার পর আমার আবার জিমন্যাষ্টিকে মন বসিয়া গেল। কাজেই আমায় অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়ে ভয়ে আমার কল্পিত আদর্শের টানে চলিতে হইত। বিশেষ কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতাম না, অথচ কিছু করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতাম।

এইরূপ যখন আমার মনের অবস্থা, তখন আমাদের বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থানান্তরে অর্থাৎ দরজিপাড়া দেওয়ান পাড়ায় উঠিয়া গেল। সেখানে যাইয়া ঐ স্কুলেই জিমন্যাষ্টিকের ক্লাশ খোলা হইল। আমি এই জিমন্যাষ্টিক ক্লাশের এক প্রধান ছাত্র। আমার প্রকৃত শিক্ষা তখন আরম্ভ হইল। এই ক্লাশে আমার উৎসাহ, আমার অভিনিবেশ, আমার শ্রম ও নিপুণতা চিত্রকরের তুলিকার পরিস্ফুটনের মত সবই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং আমার ভাগ্য-বিধাতা আমার ভবিষ্যতের সমস্ত আভাস পাইয়া উপর্য্যুপরি চারি বৎসর আমাকে ঐ শিক্ষার প্রথম পারিতোষিক দিয়াছিলেন। ইহাই আমার জীবনের সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্যোগ

জিমন্যাষ্টিকের খেলায় আমার পারদর্শিতা দেখিয়া দেওয়ান পাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের তদানীন্তন জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয় আমায় খুব উৎসাহিত করিতেন। এইরূপে ঐ বিদ্যালয়ে চারি বৎসর কাটিয়া যায়। একদিকে যখন আমার প্রবৃত্তির অনুরূপ উৎসাহ লাভ করিতে লাগিলাম, অন্যদিকে পড়াশুনায়ও তখন আমায় মন বসিতে লাগিল। আর লেখা পড়া ততটা বিরক্তিকর বোধ হইত না। ক্লাশের অন্যান্য ছাত্রেরা যেমন অধ্যয়ন করিত আমিও সেইরূপ করিতাম, তবে ক্লাশের পাঠাভ্যাসে ততটা উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিতাম না বটে।

ঐ চারিবৎসর পরে আমি ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে ইংরাজী শিখিবার জন্য ভর্ত্তি হই। এখন যেখানে যোড়াবাগান পুলিশ ও পুলিশকোর্ট, সেই বাড়ীতেই তখন ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউশন ছিল। সাধারণে তাহাকে ডফ্ সাহেবের স্কুল বলিয়া জানিত।

আমার খেলার ঝোঁকে তখন আমি বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয়ের সহিত সোণাগাজীর এক জিম্ন্যাষ্টিকের আখড়ায় যোগ দিয়া-ছিলাম। সে আখড়ার মালিক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র শীল। আমরা প্রত্যহ বৈকালে সেই আখড়ায় জিমন্যাষ্টিক করিতে যাইতাম।

হরিজন্টাল বার ও প্যারালাল বারের অনেক খেলা ঐ আখড়ায় শিখি। বৈষ্ণব বাবুই সে সমস্ত শিক্ষা দিতেন। ৮।১০ জন ছাত্র ছিল। তথায়ও আমি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিয়াছিলাম।

এইরূপে যখন আমাদের একটী দল বাঁধিতেছিল, তখন ডফ্ সাহেবের স্কুলের পশ্চাদ্ভাগে অখিলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় তাঁহার আখড়া চালাইতে ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহার ব্যায়াম কৌশল দেখিয়াই আমার প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। তাঁহাকে আমাদের স্কুলের সান্নিধ্যে দেখিয়া আমরা সদলে তাঁহার আখড়ায় যোগদান করি; তথায় হরিজন্টাল বারের আরও অনেক প্রকার কসরৎ শিখিয়া লই। তিনি যত্ন ও আগ্রহ করিয়া আমাকে নানাপ্রকারে কৌশলী করিয়া তুলেন। এক এক রকম কসরৎ শিখিতে যে কি উৎসাহ হইত ও শিক্ষা হইলে বিশেষতঃ যেদিন প্রথম কৃতকার্য্য হইতাম, সেদিন যে কি আনন্দ লাভ করিতাম, তাহা লিখিয়া আর কি বুঝাইব। যাঁহারা এ পথের একটু আধটু পরিচয়ে পথিক হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়া লইবেন।

এইরূপে দুই বৎসর শিক্ষার পর আমি নিজে বেনেটোলায় একটা দল খুলিয়া একটী আখড়ার পত্তন করি। আমার সঙ্গে আরও ৮।১০ জন উৎসাহী যুবক জুটিয়াছিল। আমাদেরই একজন সমস্ত খরচের ভার গ্রহণ করেন। আমরাও কিছু কিছু চাঁদা দিতাম। সেখানে জিমন্যাষ্টিকের অনেক প্রকার সরঞ্জামের যোগাড় হয়। রিং, ট্রাপিজ, বার, সবরকম অনুষ্ঠানেরই আয়োজন হয় এবং সবরকম খেলোয়াড়ই তৈয়ারি হইতে থাকে।

আমাদের পরিচয় ছিল "Star Acrobatic Co."। ৺দুর্গাপূজার সময় আমরা মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ী খেলা দেখাই মনে পড়ে এবং আমার খেলা দেখিয়া মহারাজ আমায় একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দেন, তাহাও মনে পড়ে। আর বড় কিছু মনে নাই—সে আজ অনেক দিনের কথা।

এই সময় মনে পড়ে-আমি ডফ্ সাহেবের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম। সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শিক্ষার কৃতিত্ব যে আমার খুব অধিক ছিল তাহা নহে, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে যেদিন হইতে আমার প্রবৃত্তির অনুযায়ী পথ দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেদিন হইতে আমার শারীরিক কৌশলীর আদর্শ দিনরাত আমায় মাতাইয়া রাখিলেও, আমি সাধারণ লেখাপড়া অবহেলা করি নাই এবং ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে সঙ্গে বৎসরের পর বৎসর একশ্রেণী হইতে তদুচ্চ শ্রেণীতে উন্নীতও হইতাম এবং তদুপযোগী পাঠাভ্যাসও করিতাম।

আমাদের বেনেটোলার আখড়া যখন চলিতেছিল, তখন হিন্দু স্কুলের জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার ৺রাজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-কুশলী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু স্কুলের অনেক ছাত্র আজও আছেন, যাঁহারা এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তিনি এই সময় এক সার্কাসের দল (Circus party) খোলেন। তাহার নামে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী হইতে অনেক acrobat ও gymnast ঐ সার্কাস দলে যোগদান করে। আমিও যোগদান করি। রাজার বাজারে ঐ সার্কাস খোলা হয়।

মাস দুই এই সার্কাসের দল খেলা করিবার পরে ৺রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র ৺হরিমোহন রায় এই দলের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তখন ঐ দল হরিমোহন রায়ের সার্কাসের দল বলিয়াই পরিচিত হইল। এবং তাঁহার বাড়ীতেই আমাদের খেলা হইত।

এইখানে যখন খেলা চলিতে থাকে, তখন আমার সহিত সুবিখ্যাত আবেল (Abel) সাহেবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি ৺রাজেন্দ্র সিংহের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আমাদের সার্কাস দলের প্রথম হইতেই এই Abel সাহেব ঘোড়ার খেলোয়ার ছিলেন। তিনি যে কেবল শিক্ষিত ঘোড়া লইয়া খেলিতেন তাহা নহে, নূতন ঘোড়াও শিখাইয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিতেন।

এই আবেল সাহেবের একটু পরিচয় আবশ্যক। তাঁহার জন্মভূমি মার্কিনদেশ। কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসী অনেকেই Wilson's circusএর নাম শুনিয়াছেন, অনেকেই তাঁহাদের খেলা দেখিয়াছেন। Abel এই Wilson's circusএ হাতীকে খেলা শিখাইতেন। Wilson's circus কলিকাতায় আসিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে Abel সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া acrobatic খেলা প্রদর্শনের জন্য থিয়েটারে থিয়েটারে যাইয়া আপনি ও আর দুই একটী ইংরাজ কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের দলের তিন চারি জনের জীবিকার উপায় হইত এইমাত্র কিন্তু একটা পুরাদস্তর circus party গড়িয়া উঠে নাই।

আমরা যখন হরিমোহন রায়ের দলে খেলা করি, তখনই Wilson's circus কলিকাতায় আসে। সেই সার্কাসের খ্যাতি প্রতিপত্তি দেখিয়াই হউক বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার লোভেই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, এই সময় Abel সাহেব circus দল খুলিবার সংকল্পে আরও চেষ্টিত হইয়া উঠেন।

আমার তখন বয়স ১৮ বৎসরের অধিক হইবে না। ৭ বৎসর বয়সে মাকে হারাই। পিতা ও পিতামহী আমাদের দেখিতেন। আমাদের অদৃষ্ট বশতঃ পিতাঠাকুরকে যখন হারাইলাম, তখন সবে মাত্র আমার বয়স ১৭ বৎসর। রহিলেন কেবল পিতামহী ঠাকুরাণী। তাঁহার শোকের সংসারে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রহিল আমাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখা। আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া শীঘ্রই আমায় বিবাহিত করাইলেন। কিন্তু কেবলমাত্র বিবাহেই সংসার গড়িয়া উঠে না। তখন আমার খেলার ঝোঁক। স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতেই পড়াশুনা ছাড়িলাম। ৺রাজেন্দ্র সিংহের সার্কাসের দলে সপ্তাহান্তে আমরা কিছু জলপানিস্বরূপ পাইতাম। সেটা যে ঠিক উপার্জ্জনের হিসাবে লইতাম তাহা নহে, তবে তাহা আমাদের ব্যায়াম খেলার প্ররোচনা আনিয়া দিত। মনে করিতাম এইরূপ করিয়া আমাদের একটা কিনারা হইয়া যাইবে এবং আমরা আমাদের মনের মতন বৃত্তির ও লক্ষ্যানুযায়ী উপার্জ্জনের পথে আগাইয়া যাইতে পারিব। তাহার পর যখন ৺হরিমোহন রায়ের দলে বাঁধা মাহিয়ানা পাইতে লাগিলাম, তখন মনে হইল রোজগারের ভাবনা ভাবিবার আর আবশ্যক নাই। আমাদের পথটা প্রশস্ত করিয়া যদি চলিতে পারি, আমাদের

লক্ষ্যের দিকে যদি আরও সাহসের সহিত আগাইয়া যাইতে পারি, তবে অর্থ অর্জন করা একটা গৌণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ তখন আমার সমস্ত কায়মনঃপ্রাণের একমাত্র চেষ্টা ছিল, কিসে আমাদের জিমন্যাষ্টিক শেখা গৌরবের জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়, কিসে ব্যায়াম-কুশলীর নিপুণতায় আমরা খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করিতে পারি এবং দেশে বিদেশে এই বিদ্যার যে সম্মান ও আদর পাওয়া যায়, কিসে তাহা লাভ করিয়া আমিও আমার জীবনের চেষ্টা সার্থক করিতে পারি। এই বাসনায় আমার মন তখন ভরপুর।

আমার যখন এইরূপ অবস্থা ঠিক সেই সময় Abel সাহেব তাঁহার সঙ্কল্পের কথা তাঁহার এক অনুচর Harrington সাহেবের মারফত আমায় জানাইলেন। Harringtonও তখন Indian Circusএ Abel সাহেবের সঙ্গে খেলা করিতেন। Harrington আমায় হিন্দীতে বুঝাইয়া দিলেন যে Abel সাহেব চট্টগ্রামে যাইয়া একটা Circus party খুলিবার মতলব করিয়াছেন, আমি যদি যাই ত' তিনি লইয়া যাইতে পারেন। প্রস্তাবটা শুনিয়া আমি উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইয়া পড়িলাম। সেদিনের প্রত্যেক ঘটনাটী আজও আমার মনে আছে। আমার তখন ঘর-বাড়ী, পিতামহী, স্নেহ মায়া, নববিবাহিতা পত্নীর কথা, সমস্তই রোদের হাওয়ায় সকালের কুয়াশার মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল। আমি কেবল ভাবিতেছিলাম কখন আমি যাইব, কতক্ষণে জাহাজে উঠিব। নূতন দেশ, নূতন সঙ্গী, নূতন জীবনযাত্রা, নূতন অবলম্বন, সবই নূতন—আমার সেই বিকাশোন্মুখ সামর্থ্যের বয়সে এক মায়ার

রাজ্য সৃষ্টি করিয়া আমায় কি যেন এক অদৃশ্য শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। অন্যান্য দিন আমি যখনই খেলা করিতে মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইতাম, আমার খেলা দেখিয়া সকলেই বেশ সন্তুষ্ট হইত, সকলেরই নিকট সাধুবাদ লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু সেদিন আমার মনে পড়ে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণলাল আজ তোমার খেলা এমন হইল কেন? কেন যে এমন হইল, তাহা আমিই জানি আর আমার ভগবানই জানেন। তিনি তখন তাঁহার কৃষ্ণলালকে আর কোথায় লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাই সেদিনকার খেলাটাও ভাল করিয়া করিতে দিলেন না। যেদিন অখিলচন্দ্র চন্দ্রের জিমন্যাষ্টিক খেলা দেখি, সেই আমার জীবনের একদিন, আর যেদিন আমায় Harrington চট্টগ্রাম যাইবার কথা বলে সেই আমার আর একদিন। আমার মনে হয়, সকল মানুষের জীবনেই এরূপ দিন আসে, কেহবা সেটাকে বরণ করিয়া লয়, কেহবা ভয় ভাবনায় হারাইয়া ফেলে। আমি বরণ করিয়াই লইয়াছিলাম। আমার যে কিছু কৃতিত্ব তাহা নহে। তবে আমার ভাগ্যবিধাতা আমায় আমার বরণীয় পথেই ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, এটাই বোধ হয় ঠিক কথা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মনে পড়ে আমি খাওয়া-দাওয়া কাপড়-চোপড় কিছুতেই মন দিতে পারি নাই। সবই যেন কলের পুতুলের মত নড়িয়াছি ফিরিয়াছি করিয়াছি। তারপর সন্ধিক্ষণে কেবল মাত্র আমার Circusএর পোষাকেই Harringtonএর সহিত বাহির হইয়া পড়িয়া একেবারে জাহাজে গিয়া চড়িলাম। তখন জাহাজেই চট্টগ্রাম যাইতে হইত।

বাড়ীতে ও ৺হরিমোহন রায়ের দলে খোঁজ পড়ে এইমাত্র জানি, কিন্তু আমি পিছনে ফিরিয়া দেখি নাই ; বোধহয় এটা আমার স্বভাবেও নাই। তিনদিন চট্টগ্রামে থাকিবার পর বাড়ীতে আমার কুশল সংবাদ পাঠাইলাম। এইখানে আমার জীবনের এক পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া আর এক পর্ব্ব আরম্ভ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম যাত্রা

তখন আমার নবীন বয়স। নূতন পথে সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রের গম্ভীর দৃশ্য, পথে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দৃশ্য। নয়ন মন ভরিয়া আনন্দরস পান করিতে করিতে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলাম।

নূতন দেশে যাইয়া দেশ দেখিবার-আকাঙ্ক্ষাও মিটাইতে ছাড়ি নাই। খেলার অবসরে স্থানীয় অধিবাসীরা আমার সহিত আলাপ করিতে আসিতেন। আমিও তাহাদের সহিত বেড়াইতে যাইতাম। তবে একটা মস্ত অন্তরায় ছিল, আমাদের ভাষা। কিন্তু যেখানে মনে মনে কোনও ব্যবধান থাকে না, সেখানে কি ভাষার বিভিন্নতায় কিছু আটকায় ?

আমাদের সার্কাসের দল, Abel Klaer Olmann Circus নামে পরিচিত ছিল। Olmann একজন জর্ম্মাণ ছিলেন, তিনিই খরচপত্র করিয়া দলটী বাঁধিয়া ছিলেন এবং তিনিই ম্যানেজার স্বরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

Abel সাহেব ঘোড়ার খেলা করিতেন। ক্লেয়ার বলিয়া একজন ছিলেন, তিনি ভোজবাজী দেখাইতেন ও কুকুর বাঁদর লইয়া খেলা করিতেন। কুমারী মড (Miss Maud) balancing ও ট্রাপিজের খেলা দেখাইতেন। হ্যারিংটন সং দিতেন এবং আমি হরিজণ্টালবার ও ট্রাপিজে খেলা দেখাইতাম। যেমন করিয়া

হউক ২ ঘণ্টার কমে আমাদের খেলা কোনও দিন শেষ হইত না। চট্টগ্রামবাসী সকলেই দেখিতে আসিতেন ও সকলেরই প্রশংসা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। সকল বিষয়েই আমাদের প্রথম আয়োজন সফল হইয়াছিল এবং আমরা উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম।

জাহাজে চড়িবার দিন হইতে আমার দৈনন্দিন জীবনের ধারা প্রায় একরকমে চলিয়াছে। সকালে চা ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া দিনের কাজগুলি একরকম ছকিয়া লওয়া যাইত। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর একটু নিদ্রা, আজও আমার সে অভ্যাস আছে। অপরাহ্ণে আমাদের দলের খেলা, কোনও দিন বা একবার, কোনও দিন বা দুইবার, সেখান হইলে কিছু পরে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম। জাহাজে চড়িয়াই আমার ইংরাজী-খানা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিনের তরে কোনও প্রকার অসুবিধা বোধ করা আমার মনে পড়ে না। আমার মন কখনও খাওয়াদাওয়া বাসা বা সঙ্গী লইয়া ব্যস্ত হইয়া ওঠে নাই। আমার লক্ষ্যও যেমন এক ছিল, আমার সমস্ত কামনা, বাসনা, অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষাও তেমনই একমুখী হইয়া চলিতেছিল।

চট্টগ্রামে ১২ দিন খেলা দেখাইয়া আমরা আবার জলপথে দক্ষিণে আকায়াবে যাত্রা করি। আকায়াব বর্ম্মা দেশের একটী বন্দর। বন্দর বটে, কিন্তু একটী গ্রাম অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর নহে। স্থানটী একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। দেখিবার মত বলিবারমত কিছুই নাই। তবে প্রথম সেইখানে বর্ম্মণদিগের প্যাগোডা দেখি। অনেকেই জানেন প্যাগোডা বর্ম্মণজাতির মন্দির। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে যেমন একটী ঘর থাকে, প্যাগোডার ভিতরে যাইবার

কোনও পথ নাই। মন্দিরের ভিতর দেববিগ্রহ থাকেন, প্যাগোডার ভিতর বর্ম্মণজাতি সঞ্চিত অর্থ মণিমাণিক্য প্রোথিত করিয়া রাখে। পূজার পদ্ধতিও এক নূতন রকমের—পয়সা দিয়া ও প্রজ্বলিত মোমবাতি সাজাইয়া পূজা সারা হয়। বর্ম্মার পুরোহিত ফুঙ্গী একজনকে আকায়াবের প্যাগোডার ধারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। তাহার পূজার ব্যবস্থাও দেখিয়াছি। হাততালি দিয়া অনধিগম্য ভাষায় বিড় বিড় করিয়া কি যে করে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি নাই।

তবে প্যাগোডা দেখিতে সুন্দর নয় বলা অত্যন্ত অন্যায় হইবে। সকলের যাহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এমন একটী উচ্চ স্থানেই সাধারণতঃ প্যাগোডা তৈয়ারি হয়। চতুঃপার্শ্বে খালি জায়গায় নানাপ্রকার ফুলগাছ দিয়া সমস্ত দৃশ্যটী নয়নরঞ্জন করিয়া রাখা হয়। তাহার পর্ব্বাদি উৎসব আছে। সেইপ্রকার উৎসবে বর্ম্মণীরা অনেকেই শোভন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্যাগোডার স্থানে সমবেত হয়। পূজার কার্য্যটা মেয়েরাই অধিক করে। পুরুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

আকায়াবেও আমরা ১২ দিন থাকি। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ জনকয়েক বর্ম্মণের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। বর্ম্মণেরা বড় অপব্যয়ী। আপনি তাহাদের বাড়ী যান, দেখিবেন দু একটা আহার্য্য বা আহারের পাত্র ছাড়া বাড়ীর আসবাব আর বড় কিছু নাই। অথচ গৃহস্বামী হয়ত বেশ রোজগেরে লোক। তাহাদের সমস্ত অর্থ পোষাকে, পরিচ্ছদে, বাবুয়ানিতে ও যাতায়াতে ব্যয়িত হইয়া যায়। আমোদ আহ্লাদ, খাওয়া

দাওয়া এই লইয়াই এদের জীবনযাপন; সুতরাং, আমরা আকায়াবে গিয়া অর্থের হিসাবে বেশ কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

ইহার পর বেসিন বন্দরে আমরা ৬।৭ দিন কাটাই। ইহাও আকায়াবের ন্যায় আর একটী জায়গা। বর্ম্মা দেশের প্রায় সকল সহরই একপ্রকার। মৌলমিনে যাইয়াও আমাদের অভিজ্ঞতা একই প্রকারের হইল। সেখানেও এক সপ্তাহে আমরা কিঞ্চিৎ লাভ করিলাম। এসকল জায়গা তখন ব্রিটিশ রাজের অধীনে, তবে উত্তর বর্ম্মা তখনও ইংরাজের করায়ত্ত হয় নাই, সেটা আরও কিছু পরবর্ত্তী কালে।

তথা হইতে আমরা রেঙ্গুনে আসিলাম। রেঙ্গুন বিদেশী-প্রধান নগর। কলিকাতার মতন রাস্তা ঘাট। অধিবাসীরা কলিকাতাবাসের সুবিধা ভোগ করে। বাঙ্গালী, নাখোদা, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারি ও সাহেব অনেক বাস করে। সমুদ্রের হাওয়া দিনরাত সহরে বসিয়া উপভোগ করা যায় এবং সেই জন্য স্থানটীও স্বাস্থ্যকর।

রেঙ্গুনের সোণার প্যাগোডা একটী বিখ্যাত দেখিবার জিনিস। সমস্তটী যেন স্বর্ণমণ্ডিত ও চূড়ায় একটী স্বর্ণছত্র আবরণ আছে। সহরের বাহিরে একটী পাহাড়ের উপর উহা অবস্থিত। পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন আছে। সমস্তদিনই তথাকার যাত্রী আছে। সহরের প্রায় সকল স্থান হইতেই ঐ প্যাগোডার দৃশ্য লোকের চোখে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে ঐ প্যাগোডায় যাইবার একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির দুইধারে নানাপ্রকার পুতুলের



শ্যাম দেশীয় বাজিকর।

Mohila Press, Cal.

দোকান। উপরে উঠিয়া প্রাচীর বেষ্টিত একটী বৃক্ষবাটিকা, মধ্যস্থলে ঐ প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া ও স্বর্ণছত্র সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করে।

রেঙ্গুনে আমাদের তিন সপ্তাহের অবস্থিতি মোটের উপর বেশ লাভেরই হইয়াছিল।

ঠিক হইল এইবার পিনাং যাইতে হইবে। এইবার টাকা পয়সা বদলাইয়া ডলার সেণ্ট করিতে হইল। ২।• আনায় একটী ডলার। এক শত সেণ্টে এক ডলার।

পিনাংএ তাঁবু. গাড়িয়া আমরা সহরের অদূরে এক জলপ্রপাত দেখিতে যাই। প্রায় ৪• ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের ক্রোড়দেশ হইতে ১• হাত চওড়া একটী স্রোত অবিরাম গর্জ্জন করিয়া নিম্নে ফেণার কোলাহল করিতেছে; জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু। সেখানে যাইয়া আমরা স্নান করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজকাল ঐ জলপ্রপাত বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রপাতের জলেই এখন পিনাং সহরের জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

পিনাং এর অধিবাসীরা চালচলনে ধরণধারণে বর্ম্মণদিগেরই মতন। তবে রংটা ময়লা। তাহারা অধিকাংশ ব্যবসায়ী লোক। বর্ম্মণদের মতন তত বাবু নহে। আমাদের সার্কাস দেখিতে যথেষ্ট লোক আসিত।

সিঙ্গাপুর আরও অধিক সভ্যতার স্থান, তাহা নামিয়াই আমরা বুঝিতে পারিলাম। সেখানে স্কুল, কাছারি, ডক, সাজান দোকান, রাস্তাঘাট ট্রাম সবই আছে। ঠিক আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সকল অঙ্গই সেখানে বর্ত্তমান। সহরটীতে পৃথিবীর সকল

২

দেশের অধিবাসীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এত বিভিন্ন দেশের এত বিভিন্ন রকমের লোকের আমদানি যে সহরটিতে সে যে কোন দেশের সহর তাহা যেন ঠিক বলা যায় না। সিঙ্গাপুরে আম কাঁঠাল পাওয়া যায়। আজকাল অনেকেই সিঙ্গাপুরের ম্যাঙ্গোষ্টিন আনারস কলিকাতায় বসিয়াই খাইতে পান। সিঙ্গাপুরে একটা মিউজিয়ম আছে, কলিকাতার মিউজিয়ম অপেক্ষা অনেক ছোট। আর দেখিবার বড় কিছু নাই।

সিঙ্গাপুরে থাকিতে থাকিতে স্থির হইল যবদ্বীপ যাইতে হইবে। যবদ্বীপে ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ। কাজেই আমাদের মুদ্রা বদলাইতে হইয়াছিল। যবদ্বীপের প্রচলিত টাকা আমাদের টাকা অপেক্ষা আকারে ছোট। টাকা ভাঙ্গাইয়া একশত সেণ্ট পাওয়া যায়; ২৫০ সেণ্টে এক ডলার। ১২ টাকায় এক স্বর্ণমুদ্রা। দশ, পাঁচ ও পঁচিশ টাকার নোট চলে।

যবদ্বীপবাসীরা দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালীরই মতন। রংটা বাঙ্গালীর অপেক্ষা আরও একটু গাঢ় ও নাকটা খাঁদা। নতুবা পিছন হইতে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইত। বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, খুব পরিশ্রমী। পরিধানে ছোট ছোট পায়জামা, গায়ে জামা, মাথায় টুপী বা একটা কাপড় বাঁধা। সকল পুরুষ কোমরে একটা করিয়া কিরীচ রাখে। এইরূপ কিরীচ হাতিয়ার রাখা ইহাদের সভ্যতার একটা অঙ্গ বিশেষ বলিলেই হয়। মেয়েরা সারং ও কোবায়া পরে। সারং কাপড় ভাঁজ করা ঘাঘরা ও নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা। কোবায়া জামা বিশেষ। মেয়েরাও সব কাজকর্ম্ম করে। জাতটা মেয়ে মদ্দ খুব মিশুকে।

দেখা হইলে "তাবে তোয়ান" অর্থাৎ আসুন মহাশয়, বলিয়া অভিবাদন করে। চাকর লোকজন মোটের উপর বিশ্বাসী। সাধারণ লোকে দাঙ্গাহাঙ্গামার বড় ধার ধারে না। যবদ্বীপের কয়েদীরা দিনমানে সাধারণ কুলিমজুরের মতন সহরের সর্ব্বত্র কাজকর্ম্ম করে। ১০।১৫ জন কয়েদী একজন সর্দ্দারের অধীনে কাজ করে। বেশ সুশৃঙ্খলে ইহাদের কাজ চলে।

যবদ্বীপবাসীদের পাখীর সখ খুব। প্রায় সকল গৃহেই পাখী পুষিতে দেখিয়াছি। ছাগল, গরু, ঘোড়া, মহিষ, মুরগী গৃহপালিত পশু। হাতে ঠেলা গাড়ী করিয়া মাল চলাচল করান হয়। এবং যাত্রিগাড়ি অর্থাৎ ডোশেডো টঙ্গার মতন পিছন ফিরিয়া বসিতে হয়। ঘোড়ায় টানে। মহিষে লাঙ্গল টানে। মোরগের লড়াই দেখাইয়া অনেকে জীবন ধারণ করে। মোরগের লড়াই দেখা ইহাদের একটা বিশেষ আমোদ। টুকরা কাঁচ সাজাইয়া কাঠি দিয়া বাজাইবার জন্য ছেলেদের যেমন এক রকম বাদ্যযন্ত্র পাওয়া যায়, যবদ্বীপের বাদ্যযন্ত্র সেইরূপ কাঠের ফ্রেমে তার দিয়া পেতলের পাত সাজান। কাঠি দিয়া উহারা বাজায় ও সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক বাজিতে থাকে। ১০।১৫ জন বাদক একসঙ্গে এইরূপ বাজনা বাজায়। এইরূপ বাদ্যকরবৃত্তি ইহাদের একরূপ পেশা।

উহাদের গৃহগুলি প্রায়ই মাচানের উপর। খোলার চাল। বাড়ীতে আসবাব খুব অল্প। শয্যা প্রায়ই মাদুর। আমাদের মতন মাদুর নহে। আরও একটু মোটা ধাঁচের। তাহাদের আহার্য্য ভাত, শুকটা মাছ ও তরিতরকারি। আলু, বেগুন,

কুমড়া ও শাক পাওয়া যায়। আক ও ধান প্রধান শস্য। নারিকেল ও তালও পাওয়া যায়। অনেক চিনির কল আছে। দেশীয় বস্ত্র, লুঙ্গি প্রভৃতি স্থানীয় শিল্পীরা তৈয়ারী করে। উহারা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত।

যবভাষা স্থানীয় ভাষা। ওলন্দাজরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, পথ ঘাট বানাইয়াছে। রেলপথ বিস্তৃত করিয়াছে।

আমরা বাটাভিয়া, বাইটেনজর্গ, শুকভূমি, বাঞ্জড্, তাঙ্গোর, সামারাং, সুরবয়া, পাশোরুয়া ও প্রবলিঙ্গ এই সকল স্থানে আমাদের খেলা দেখাই। আমাদের খেলা দেখিতে উহাদের আগ্রহ বেশ দেখিতে পাইতাম। ওলন্দাজরাও অনেকে আমাদের খেলা দেখিতে আসিত।

সামারাং হইতে স্মিরো আগ্নেয়পর্ব্বত দেখা যায়। স্মিরো হইতে দিনরাত ধূম উদ্গীরিত হইতেছে।

যবদ্বীপের জল হাওয়া ভাল। অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর বর্ষাকাল। শীতকাল নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে যেমন সব সময় একঋতু বর্ত্তমান যবদ্বীপেও অনেকটা সেই রকম। আমরা মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম। ঐ কয় মাস ঐখানকার সর্ব্বপ্রধান ঋতু।

যবদ্বীপ হইতে আমরা কলিকাতায় আসিবার মনস্থ করি। তবে কলিকাতায় ডিসেম্বরের পূর্ব্বে সার্কাসখেলা জমে না। কাজেই পথে আমরা পুনর্ব্বার সিঙ্গাপুর, পিনাং ও রেঙ্গুন হইয়া আসি এবং কিছুদিন করিয়া থাকিয়া খেলা দেখাইয়াও আসি।

কলিকাতায় আসিয়া আমরা ময়দানে তাঁবু গাড়িলাম।

যথেষ্ট দর্শক জুটিত। ১ মাস বেশ সমারোহের সহিত আমাদের খেলা চলিল। সেটা ডিসেম্বর মাস।

১ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া বাড়ীতেই থাকিতাম। পিতামহী ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই আগ্রহের সহিত আমার একবৎসরের প্রবাসের কাহিনী শুনিতেন। আমার উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত দেখিয়া সকলেই অল্পবিস্তর আনন্দিত হইয়াছিলেন। আমিও আমার প্রথম বারের বৈদেশিক ভ্রমণ আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের নিকট বেশ উৎফুল্লতার সহিত বলিতে পারিতাম। আমার তখন মনে হইত আমার জীবন পথের যাত্রা সুরু হইয়া গেল, আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। ইহাই আমার প্রথম যাত্রার কাহিনী।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় অভিযান

জানুয়ারি মাসে আমরা আবার জাহাজে চড়িলাম। একেবারে সিংহলের পথে। আমরা একেবারে কলম্বো যাই।

আমি নূতন বিদেশী। এদিকে এবেল সাহেব আমাদের দলের মালামাল লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। আমি হ্যারিংটনকে লইয়া নূতন দেশের নূতন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বেড়াইতে গেলাম।

হারবারে একটা বড় লাইট্ হাউস আছে। ব্রেক ওয়াটার পাথর দ্বারা বাঁধান আছে, তাহার উপর ভারতমহাসাগরের বড় বড় ঢেউ দিন রাত আছাড় খাইতেছে।

দূর হইতে কলোম্বো সহর দেখা যায় না। যেন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটা স্থান দেখায়। নামিয়া সহর দেখিয়া বড় একটা ঐশ্বর্য্যশালী সহর বলিয়া বোধ হইল না। দোকান পাট বেশ ভাল আছে। পথ ঘাটও বেশ ভাল। গ্যাসের আলো আছে। কলের জলও আছে। খাবার জিনিষ প্রায় সবই পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে, কলা, নারিকেল, আনারস খাইয়া ছিলাম। সাধারণের খাদ্য ভাত, মাংস ও তরিতরকারি।

লোকগুলি আকার প্রকারে ভারতবাসীরই মতন তবে রংটা একটু কালো। পরিধানে সারং বা লুঙ্গি। গায়ে জামা। মাথায় টুপি থাকেনা, তবে বড় বড় চুল চিরুণী দিয়া ফিরাইয়া

রাখা হয়। প্রায় সকলেই জুতা পায়ে দেয়। মেয়েরা চটি পায়ে দেয়।

বাড়ী অধিকাংশই পাকা প্রাচীরের উপর খোলার চাল। বাড়ী সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসবাব পত্র আমাদের এখানকারই মতন।

সিংহলবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। লোকে বেশ সদ্ব্যবহার করে।

স্কুল কাছারী আছে। ট্রাম আছে। ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, রিক্শ প্রভৃতি পথে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলম্বো হইতে আমরা কাণ্ডি যাই। কাণ্ডি, তুর্ণীপল, নিসম্বো, অনুরাধাপুরী ও জাফ্না এই কয় সহরে খেলা দেখাইয়া আমরা কলম্বো ফিরিয়া আসি। এই সমুদয় ভ্রমণে আমরা তিন মাস কাটাই।

কলম্বো হইতে সিঙ্গাপুর যাইয়া কিছু দিন খেলা হয়। পরে আমরা হংকং যাত্রা করি। হংকং ক্যান্টন নদীর মোহানার পূর্ব্ব দিকে একটী ছোট দ্বীপ। জাহাজ হইতে হংকং একটী গ্যালারীর ন্যায় সাজান।

জাহাজ হইতে শাম্পানে চড়িয়া আমরা কূলে অবতীর্ণ হইলাম। হোটেলে জিনিষ পত্র রাখিয়া হ্যারিংটন ও আমি সফরে বাহির হইলাম। প্রধান যান রিক্শ। চীনারাই টানে। চীনারা সাধারণতঃ খুব কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ। আমাদের সহিত দু-একটা ইংরাজী বুলি বলিয়া কোনও রকমে কথা বার্ত্তা চালাইয়া লয়।

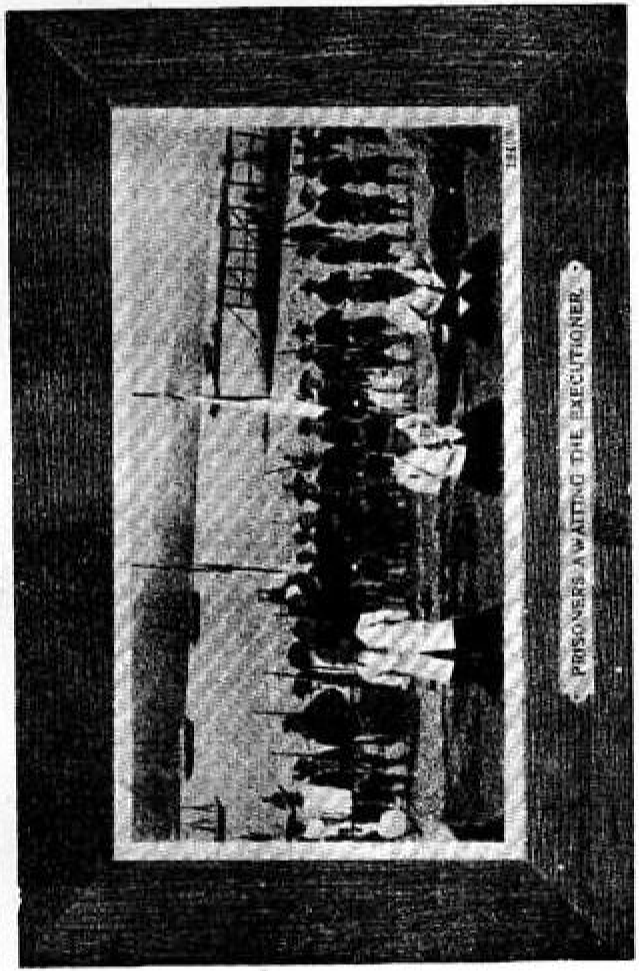
হংকংএর অধিবাসী তিন রকম। প্রধান হইল দক্ষিণ

চীনের অধিবাসীরা। ইহারা প্রধানতঃ ব্যবসাদি লইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসিন্দা হইল লাথোনর। ইহারা ভারতজাত কাপড়, জামার থান, ছিট, রত্নাবলী ও অন্যান্য শিল্প সম্ভার লইয়া ব্যবসা করে। আর বাসিন্দা ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী, পদীয়ান ও বণিক। মোটের উপর সমৃদ্ধিশালী সহর বলিয়াই মনে হয়।

পথ ঘাট আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনান্বিত, কলের জল ও গ্যাস আছে।

চীনারা ভাত খায় ও শূকরের মাংস ইহাদের বড় প্রিয়। সমস্ত দিন পরিশ্রম করে। প্রাতঃকাল হইতে দোকান পাট খুলিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বেচা কেনা চলে। নীচে দোকান ও উপরে বাসা। এক এক বার আহার করিয়া আসিয়া আবার দোকানেই থাকে। প্রধানতঃ তিন বার আহার করে। জলপান করা খুব কম দেখিয়াছি। সমস্ত দিনই চা খাইতেছে। আমাদের মত দুধ চিনি দিয়া যে চা খায়, তাহা নহে। বড় একটা পটে (pot) চা সিদ্ধ গরম জল রাখিয়া দেয় এবং যখনই আবশ্যক হয় এক একটী ছটাকে Cupএ চা ঢালিয়া তাহাই পান করে। তাহারা চাকে "ওচা" বলে।

হংকং হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে এক ময়দানে আমাদের খেলার তাঁবু পড়ে। ঐ ময়দানের নাম "Causeway Bay"। আমরা এক মাস থাকি। আমাদের ভরপুর অবস্থান কালটা প্রত্যহ তাঁবু দর্শকে ভরিয়া যাইত। খুব ধীর শান্ত শিষ্ট ভাবে আমাদের খেলা দেখিত। গোলমাল কোনও প্রকার



চীন দেশীয় জল-দস্যু (৩৫ পৃষ্ঠা)।

Mohila Press, Cal.

হইত না বলিলেই হয় এবং যখন তাহাদের মতে আশ্চর্য্য বা সাধুবাদযোগ্য কোনও ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শিত হইত তাহাদের একমাত্র কথা ছিল "হাইঅ"। এই "হাইঅ" ধ্বনি আশ্চর্য্য ব্যঞ্জক, বাহবা ব্যঞ্জক ও সাধুবাদ ব্যঞ্জক।

চীনাদের বাড়ী কাঠের। দুতলা, তিন তলা অনেক রকম আকারের আছে। মেঝেতেও কাঠ মারা। টেবিল, ড্রয়ার, চেয়ার, তক্তাপোষ প্রভৃতি আসবাব দেখা যায়। আপনি বাড়ীতে যান, বসিবার জন্য চেয়ার দিবে, কথা বার্ত্তায় সন্তুষ্ট করিবে। আমাদের এখানে যেমন পান তামাকের ব্যবস্থা আছে চীনদেশে সেইরূপ "সাম্পু" খাইতে দেয়। "সাম্পু" চাউল হইতে তৈয়ারী এক প্রকার মদ্য। আপনার সম্মুখে বোতল আনিয়া দিবে এবং কাচপাত্র আনিয়া দিবে। ঐ কাচপাত্র উহাদের স্বদেশজাত। আপনার ইচ্ছানুসারে আপনি "সাম্পু" ঢালিয়া খাইতে পারেন।

হংকং হইতে শাংঘাই যাইলাম চারিদিন সমুদ্র পথে। এই বন্দরটী চীন সাম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্য ক্ষেত্র এবং ইয়াং-শিকিয়াং নদীর মোহানায় অবস্থিত। শাংঘাইয়ে ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মণ, জাপাণী, ইটালিয়, প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির এক একটী বিভিন্ন চক আছে। এই বিভিন্ন চকের পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় এক পোয়া করিয়া হইবে। এইরূপ ৭টী লিগেশণ বা চক আছে। বিভিন্ন চকের বিভিন্ন জাতির সব নিজেদের পুলিশ প্রহরী ও মিউনিসিপ্যালিটী আছে। তবে বোধ হয় গ্যাস ও কলের জল এক জায়গা হইতে সরবরাহ হয়। লিগেশণ নিয়মাবলী পরস্পর প্রভেদ থাকিলেও সাধারণতঃ এক

লিগেশণ হইতে অন্য লিগেশণএ যাতায়াত কোনও রূপ নিষিদ্ধ নহে। স্থায়ী বিদেশীয়েরা যে যার লিগেশণএর ভিতর আড্ডা করিয়া আছেন। চীনারা অধিকাংশ তাহাদের প্রাচীর বেষ্টিত পল্লীর ভিতর বাস করে। বিদেশী যাইলে চীনাপুলিশ তাহাদের সঙ্গে করিয়া চীনা সহর দেখাইয়া আনে। সেখানে একটা লৌকিক গুজব আছে যে বিদেশী লোক চীনা সহরের ভিতর যাইলে মারা পড়িতে পারে। কিন্তু আমি ও হ্যারিংটন দুইজনে ঘুরিয়া আসিয়া সে গুজবের যে কোনও ভিত্তি আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিভিন্ন লিগেশণএ বা চকের ভিতর ও অনেক চীনা দোকানদার ও বাসিন্দা থাকে।

মোটের উপর সহরটী বেশ বৃহৎ। এখন ত প্রথম বার যাই, ইহার পরেও তিন চারিবার শাংঘাই গিয়াছি। ক্রমেই সহরটী আকারে বাড়িতেছে। অনেক অনেক নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, পূর্ব্বে যে সব স্থল খোলা ময়দান ছিল এখন সে সব নানা প্রকার আবাসে পূর্ণ হইয়াছে।

আমরা ইংরাজ চকে বা লিগেশণএর এক ময়দানে তাঁবু গাড়ি। সব রকম দেশী ও বিদেশী অধিবাসী আমাদের খেলা দেখিতে আসিত। সেবারে এখানে আমরা একমাস থাকি।

আমরা যখন শাংঘাই যাই তখন তথাকার গ্রীষ্ম কাল। গ্রীষ্ম হইলেও সেই কালটাই আমাদের মতন খেলার আমোদের পক্ষে উপযুক্ত সময় ছিল। কেননা সেখানকার গ্রীষ্মে কোনও প্রকার কষ্ট হয় না। তথাকার শীতকালে রীতিমত বরফ পড়ে।

ইহার পরে আমরা শীতকালে এখানে ইমারত তৈয়ারী করিয়া দরজাদি বন্ধ করিয়া খেলা দেখাইবার আয়োজন করি কিন্তু সেবারে আমাদের অত চেষ্টা সত্বেও আমরা তেমন জমাইতে পারি নাই। শীতে লোক বাড়ীর বাহির হইতেই যেন চায় না। প্রথম বারে গ্রীষ্মকালে কিন্তু আমাদের খেলা বেশ জমিয়াছিল।

হংকংএর চীনা অধিবাসী বড় একটা উচ্চ শ্রেণীর নহে, কিন্তু শাংঘাইয়ের চীনাদের ভিতর অনেক সম্ভ্রান্ত চীনবাসী দেখিয়াছি এবং অনেক চীন ও ইউরেশীয় সঙ্করের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ইহারা ভারতবর্ষের ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের মত একটী বিভিন্ন সম্প্রদায়। ইহাদিগকে চৈনিক জাতি হিসাবে চীন রাজ্যে গণনা করা হয় না বা চীনা সমাজভুক্ত গণ্য করা হয় না। কোনও চীনা বালিকা যদি বিদেশীয় রক্ষিতা হয় বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া বিধর্ম্মীর সহিত সহবাস করে তবে সে বালিকা চীনা সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। চীনাপুরুষ যদি কোনও ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের সহবাসে থাকে তাহাকেও সমাজে পতিত হইতে হয়। সে স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের মতন না করিলে তাহার আর সমাজ গত হইবার উপায় নাই। এইরূপে চীন দেশে ইউরেশীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চীনাভাষা ও ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করে।

ইহার পরে যাই চিফু। চিফু আরও উত্তরে একটী ছোট বন্দর। অধিবাসী অধিকাংশই চীনা। এখানে গ্যাস ও কলের

জল নাই। চিফুতে একজন ইংরাজ Consul থাকেন। এক সপ্তাহে আমরা বেশ কিঞ্চিৎ লাভ করি।

চিফু হইতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা জাহাজে যাইয়া আমরা জর্ম্মান উপনিবেশ শিংটাও যাই। শিংটাও হারবার বেশ সুবিস্তৃত ও সুনির্ম্মিত। হারবার হইতে একপোয়া যাইয়া তবে সহর। সহরটী বেশ ছবিটির মতন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশোভন অট্টালিকায় সুসজ্জিত। জর্ম্মন ও চীনা অধিবাসীরা আমাদের সহিত খুব মেলামেশা করিত মনে পড়ে। আমাদের খেলা দেখিবার আগ্রহও যথেষ্ট ছিল। একেবারে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ অধিবাসী বলিলেই হয়, সেইজন্য আমরা যত বিদেশী বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম, ততই অধিবাসীদিগের আদর যত্নে, তাহাদের সহানুভূতি ও উৎসাহে আমাদের বিদেশ বাসের পার্থাক্যানুভূতি কমিয়া যাইতে লাগিল। ব্যবসার খাতিরে এতদিন খেলা দেখাইয়া আসিতে ছিলাম, কিন্তু তাহার ভিতরও যে মানুষে মানুষের মধ্যে দেশের ভেদ, ভাষার ভেদ, অবস্থানের ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ ডুবাইয়া একটা মিলনের স্রোত আছে তাহা আমরা শিংটাও বাসে প্রথম বুঝিতে পারি।

একটা রাত জাহাজে চড়িয়া আমরা টিণ্টশিন যাই। পিহো নদীর উপর অবস্থিত। ইহা একটী শাংহাইয়ের মতন "খোলা" বন্দর। চীন দেশে এইরূপ খোলা বন্দর অনেক আছে। ইহার অর্থ এই যে যে কোনও জাতির এখানে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার আছে। টিণ্টশিন কথাটার একটা অর্থ আছে। "স্বর্গের পারঘাট" বলিয়া তাহা অনুবাদ করা গেল।

আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া, হোটেলে জিনিষ পত্র গুছাইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম, অবশ্য সেই আমরা দুজনে হ্যারিংটন ও আমি। চীনে সহর, আর দেখিলাম অনেক জাপানী ও কতকগুলি ইংরাজ।

হংকং হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সহরেই কতকগুলি করিয়া জাপানি পণ্যবিলাসিনী দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারা অধিকাংশই ইউরোপীয় সাহায্যে উপজীবিকা অর্জ্জন করে। সমুদ্রকূলে বন্দরগুলিতেই ইহাদের বাস। ইহার পরে আমরা চীনের রাজধানী পিকিনে যাইয়া ইহাদের দেখিতে পাই নাই।

টিণ্টশিনে আমরা ২ সপ্তাহ কাটাইলাম। টিণ্টশিন হইতে পিকিন যাই রেল পথে। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি পিকিন চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী। কাজেই যতই নিকটে যাইতে লাগিলাম ততই ঔৎসুক্য ও কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। চীনা booking clerk হইতে চীন driver, guard, চীনা ষ্টেশন মাষ্টার, সমস্তই চীন দেশের নিজস্ব বলিয়া জানাইয়া দেয়। আমরা সব প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম। প্রথম শ্রেণীর গাড়ি এখানকারই মতন। পিকিন ষ্টেশনটী বেশ বড়, বেশ সুদৃশ্য এবং সবরকম অনুষ্ঠানে সজ্জিত।

পিকিন সহরটী দুইভাগে বিভক্ত। একটী সহর কেল্লার ভিতর আর একটী কেল্লার বাহির। কেল্লার সহর প্রাচীর বেষ্টিত এবং তথা হইতে বাহিরের সহরে আসিতে যে বৃহৎ ফটক আছে তাহাকে "হাতামান" গেট বলে। রাত্রে সে গেট বন্ধ হয়। বাহিরের সহরটী খুব বড় সহর। আমরা কেল্লার ভিতরে

যাইয়া উঠিলাম। কেল্লার ভিতর ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির এক একটী লিগেশন আছে। মনে পড়ে বোধ হয় এইরূপ ফরাসী ইংরাজ ও জর্ম্মন তিনটী আমরা দেখিয়াছিলাম। আমরা ইংরাজ লিগেশন এ আশ্রয় লইয়াছিলাম। কিছু দূরে কেল্লার ভিতর আমরা খেলার তাঁবু গাড়ি। আমাদের খেলার প্রথম দিন হইতেই আমাদের দর্শকের ভীড় যথেষ্ট হইতে লাগিল। কেল্লার ভিতর আবার প্রাচীর বেষ্টিত একটী পল্লীর মতন আছে। অনুসন্ধানে জানি সেটা হইল রাজবাড়ী। এতদ্ব্যতীত কেল্লার ভিতর ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য রাজকীয় আফিস প্রভৃতি আছে।

এতদিন যে আকার প্রকারের চীন জাতিকে হংকং হইতে দেখিয়া আসিতে ছিলাম, পিকিনে আসিয়া তাহা হইতে বিভিন্ন, লম্বা, চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট একদল চীনা দেখিলাম। ইহারা উত্তর চীনবাসী বলিয়াই পরিচিত। ইহাদিগকে দেখিলেই মনে হইত ইহারা দক্ষিণ চীনাবাসীদিগের অপেক্ষা উন্নত ও সম্ভ্রান্ত।

পিকিনবাসী সকলেই খুব পরিশ্রমী। তবে দুইচারিজন ধনী আছেন যাঁহারা কোনও কাজকর্ম্ম করেন না। তাঁহারা যে কোনও কাজকর্ম্ম করেন না তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহারা প্রায়ই একহাতে একটী বড় নখ রাখিয়া দেন।

পিকিনের স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ মাঞ্চু স্ত্রীলোকেরা সদা সর্ব্বদাই মুখে রং মাখিয়া থাকে, কেশ সুবিন্যস্ত থাকে, মাথায় চিরুণির মতন একটা জিনিষ চুলে বসান দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের পা ছোট করার কথা আপনারা অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। ৩½ ইঞ্চি লম্বা পা-ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর পক্ষে অঙ্গসৌষ্ঠব।

শুনিয়াছি শিশুকালে বালিকার পায়ের তলার একরকম অস্ত্র চিকিৎসা করা হয়, এবং সেই অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা পায়ের চারি পাঁচটী আঙ্গুল মুড়িয়া কতকগুলি মসলা দিয়া একেবারে লৌহময় পাদুকায় বাঁধিয়া রাখা হয়। তাহাতেই নাকি সেই সকল মসলা সংযোগে চরণটীও একেবারে আকারে ছোট হইয়া যায় ও কোনও প্রকার কষ্টও বালিকাকে ভোগ করিতে হয় না। শুনা যায় বালিকার বয়স যখন ১৫।১৬ হয় তখন ঐ লৌহ পাদুকা খুলিয়া লওয়া হয় ও তৎপরিবর্ত্তে একরকম আঙ্গুল দুই চওড়া ফিতায় চরণদুটী জড়াইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ চরণ কুঞ্চিত করা প্রথাটী চীনের সম্ভ্রান্ত ঘরেই প্রচলিত। আমরা আমাদের সার্কাসে সম্ভ্রান্ত চীনা মহিলাকে তিন চারিজন পরিচারিকার সহিত আসিতে দেখিয়াছি। ঐ সকল পরিচারিকার চরণ কিন্তু ছোট করা নহে।

মেয়েদের পোষাকের কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ করি। সাধারণতঃ রেশমী পায় জামা ও ঢিলা জামা মেয়ে পুরুষ সমান-ভাবে পরিধান করে। পুরুষদের জামার সামনে বোতাম থাকে, আর মেয়েদের জামা আমাদের দেশের ঘাম জামার মতন পাশে ঘুন্টি দেওয়া থাকে বা ফিতা বাঁধা থাকে। মেয়েদের অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যও বড় দেখি নাই। মাথায় সোনার কাঁটা দেখিয়াছি কানে দুল দেখিয়াছি ও হাতে আংটি। পুরুষদের কাহারও কাহারও মাথায় টুপি দেখিয়াছি। জুতা প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষই ব্যবহার করে। তাহা তাহাদের দেশের ফ্যাশান অনুযায়ী দেশেরই তৈয়ারি জিনিষ। তাহাদের জুতা অধিকাংশই চটির মতন,

কাপড়ের তৈয়ারি এবং গোড়ালি একটু কাপড় ঢাকা। বলা বাহুল্য চীনারা কোনও বিদেশী জিনিষ লইয়া নিত্য ব্যবহার করে না। বড় বড় ঘরের মেয়েদের ছাতা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। পরিচারিকারা ছাতা লইয়া মনিবের জন্য ছাতা ধরিয়া যায় দেখিয়াছি। সে ছাতা বাঁশের ও স্বদেশ জাত।

চীনের সকল সহরেই দেশীয় বারবিলাসিনী আছে। তাহাদের যে বিশেষ কোনও উৎপাত আছে তাহা মনে হয় না। ইহারা ১০।১৫ জন দলবদ্ধ হইয়া একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দলপতির অধীন এক একটী বাড়ীতে বাস করে ও ব্যবসা চালায়। আমাদের সার্কাস ক্ষেত্রেও ইহাদের আসিতে দেখিয়াছি।

বাড়ীগুলি অধিকাংশই বাঁশের তবে কাঠেরও আছে। ছাদ সবই বাঁশের ও খোলার। বাড়ীর আসবাবের মধ্যে কতকগুলি টুল, টেবিল। শয়নের জন্যও টেবিল থাকে, মাদুরে শোয় ও কাঠের বালিশ মাথায় দেয়।

আপনারা "হুহুরে চীন" শুনিয়াছেন। সমস্ত সহরে নানা প্রকার শিল্পকার্য্য দেখিয়াছি। বাঁশের আসবাব, দড়ি বা সুতার কারুকার্য্য, বস্ত্রের উপর চুমকির কাজ, নানা প্রকার কাঠের কাজ, এই সব লইয়া অনেক লোক দিন রাত লাগিয়া আছে।

মুরগি ও বিড়াল ইহাদের প্রধান গৃহ পালিত পশু। পাখীর সখ ইহাদের খুব আছে। নাম মনে নাই, কিন্তু দুইতিন রকম কালো রংএর পাখী দেখিয়াছি। অনেক পথিককে পাখীর খাঁচা হাতে ঘুরিতে দেখিয়াছি। পাখীর স্বরের জন্য কি বর্ণের জন্য কিসের জন্য সে সখ তাহা বুঝিতে পারি নাই।



চীন দেশীয় জল-দস্যুর আক্রমণ।

বাঙ্গালীর হাতে যেমন ছড়ি চীনে ভদ্রলোকের হাতে তেমনি ধুমপানের নলিচা। সঙ্গে সঙ্গে তামাকের থলিও থাকে এবং আবশ্যক হইলে পথ চলিতে চলিতে দু' একছিলিম উড়িয়া যায়।

পথ প্রস্তরখণ্ড নির্ম্মিত বেশ প্রশস্ত। সর্ব্বদাই রিকশ চলিতেছে বা একচক্রী (wheel barrow) চলিতেছে। একচক্রী গুলির চাকার দুই পাশে দুইটী আসন থাকে। সেই আসনে বসিলে আরোহির পা প্রায় ভূমি সংলগ্ন হয়, তবে একখণ্ড দড়ির উপর পা রাখিয়া যাইতে হয়। গাড়ীর চালক পশ্চাদ্দিক হইতে ঠেলিয়া গাড়ী লইয়া যায়।

স্কুল আছে কিন্তু সেগুলি পাঠাগার বা পাঠশালা বলিলেই ঠিক বলা হয়। ১৫।২০ জন একটী শিক্ষকের নিকট পাঠ অভ্যাস করিতেছে—এরূপ পাঠশালা পথের মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হইয়াছিল সকলেই লিখিতে পড়িতে জানে। আমরা সেখানে যাইয়া আমাদের বিজ্ঞাপনের জন্য একটী দো-ভাষী নিযুক্ত করিয়াছিলাম; সে প্রত্যহ আমাদের খেলার বিষয় লিখিয়া লিথো করিয়া হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করাইত। আমরা, ছাপাখানা দেখি নাই, তাই আমাদের লিথো করিতেই হইত।

আজ কাল পিকিনে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক ভাষা সকল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র লণ্ডন হইতে প্রকাশিত একখানি

নূতন বই হইতে নিম্নলিখিত বর্ণনাটী উঠাইয়া দিবার প্রলোভন ত্যাগ করিলাম না—

"There is a deep-rooted respect for learning amongst all classes (in China). All offices are gained solely by public examination, and a man may be examined even at the age of eighty".

মৃতের শোভাযাত্রা দেখিয়াছি। মৃত্যুর পর একটী বাক্সে শবটীকে রাখিয়া বাক্সটী বন্ধ করা হইলে ১০।১৫ দিন এমন কি এক মাস পর্য্যন্ত ঐ বাক্স (coffin) বাড়ীতে পড়িয়া থাকে। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সব দেখিতে আসে। উহাদের দেশে কাঁদিবার জন্য ভাড়াটিয়া লোক পাওয়া যায়। অর্থ লইয়া ৪।৫ জন লোক আসিয়া হাত বুক চাপড়াইয়া বেশ শোরগোল তুলিয়া আধ ঘণ্টা তিন কোয়াটার নানা ছাঁচে তাহারা গৃহের সদরে বসিয়া কাঁদিয়া যায়। গোরস্থানে যাত্রার দিনে নানা প্রকার আয়োজন হয়, বাজনা বাদ্য করিয়া শোভাযাত্রা যায়। সঙ্গে সঙ্গে লোক কেহ বা ৫ দিনের কেহ বা ১০ দিনের কেহ বা এক মাসের খাবার, শোভাযাত্রার সহিত লইয়া যায়।

এই খাবারের সঙ্গে একটী আস্ত শূকরের মাংস দেওয়া চাই-ই। শব কবরস্থ হইলে, কবরের উপর ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য সাজাইয়া রাখা হয়; বিশ্বাস এই যে পরপারের যাত্রীর এতদ্দিনের পথের খোরাক দেওয়া হইল। ঐ সকল খাবার ফুঙ্গিরা বা চীনা পুরোহিতেরা লইয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের

আনুসঙ্গিক আরও শোভাযাত্রা দেখিয়াছি কিন্তু তাহার অর্থ নিরূপণ করা ঘটিয়া উঠে নাই।

আমরা যখন সেখানে ১৫ দিন ছিলাম তখন সেখানে শীতের প্রাক্কাল। মোটের উপর জল হাওয়া বেশ ভাল লাগিত। আর সবই যেখানে নূতন, সেখানে ১৫ দিন বেশ ভাল লাগিবারই কথা। ফল ফুলও কিছু কিছু আছে। তখন আমরা বাতাবীলেবু পাইয়াছিলাম, মাছও মধ্যে মধ্যে পাইয়াছি। এদেশে মাছ-রাঙা যেমন আছে চীনে এক রকম বকজাতীয় শাদা রংএর পাখী আছে তাহারা জেলেদের দ্বারা পালিত হয়। তাহারা নৌকার উপর বসিয়া ডুব দিয়া ঠোঁটে করিয়া মাছ তুলিয়া আনিয়া দেয়। রং বেরংএর ফুল দেখিয়াছি, চোখে ধরে, কিন্তু একেবারে গন্ধহীন।

চীনারা বেশ সুজন বলিয়াই মনে লাগিয়াছিল। পথে ঘাটে কোনও দুর্বৃত্ত আচরণ আমরা দেখি নাই। বাড়ী গেলে "শাংপু" খাইতে দিয়া অতিথি সংকার করে। চাকর, কুলি, মজুর, সকলেই নির্ব্বিবাদে নিজের নিজের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। আমাদের সার্কাসের দর্শকবৃন্দ বেশ শান্তভাবে খেলা দেখিত এবং প্রশংসা যোগ্য খেলা দেখিলে "হাইঅ" বলিত।

আমরা চীনের বিখ্যাত great wall দেখিতে যাইতে পারি নাই, তবে ভ্লাডিভষ্টকের পথে তাহা দেখিয়াছি। সহরের প্রাচীর যাহা দেখিয়াছি তাহাও এক বৃহৎ ব্যাপার। এই প্রাচীর এত প্রশস্ত যে তাহার উপর দিয়া ৬ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারে। এই প্রাচীরের এক স্থানে একটী

মান মন্দির আছে, তবে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা ভগ্ন বলিলেই হয়।

পিকিন হইতে রেল পথে আমরা ভ্লাডিভষ্টক্ যাই। তিন দিন তিন রাত রেল পথে যাইতে হয়। একই গাড়ীতে সমস্ত পথটা যাই, কোনও গাড়ী বদল করিতে হয় নাই।

আপনারা জানেন ভ্লাডিভষ্টক্ রুস সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে প্রধান বন্দর। সমুদ্রের কূলে একটা বৃহৎ কেল্লা আছে। আমরা যখন যাই তখন সমুদ্রে দুইখানা রণতরীও দেখিয়াছিলাম।

রুসদিগকে দেখিতে বেশ দীর্ঘকায় ও হৃষ্ট পুষ্ট। প্রায় অধিকাংশ লোকেই দাড়ী রাখে। অনেকেই পায়ে top boot পরে অর্থাৎ হাঁটু পর্য্যন্ত জুতা পরে। পোষাক অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজের মতন, তবে মাথার টুপি অনেকেরই cossack cap। কসাক ক্যাপ অনেকটা তুর্কী ফেজের আকার, তবে কাল কুঞ্চিত পশমে ঢাকা।

ভ্লাডিভষ্টকে রুস ছাড়া চীনা ও কোরিয়ার মানুষদিগের বাস আছে। সহর এবং সহরের অধিবাসী সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য বাজার দেখিয়াছি। সেখানে মাংস ও তরিতরকারী ব্যতীত মাছও পাওয়া যায়। তবে সে মাছ সমুদ্রের। এখানে আসিয়া আবার গরু দেখিয়াছি—চীনে এতদিন দেখিতে পাই নাই। রুস দেশের অশ্ব জাতিও খুব উৎকৃষ্ট, এবং সাইবিরিয়ার টাট্টু এক প্রসিদ্ধ জানোয়ার।

আমরা সাতদিন পরে জাপানে যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলাম।

আমাদের জাহাজ নাগাসাকি যাইয়া লাগিল। সেইখানেই আমরা প্রথম জাপানের ভূমি স্পর্শ করিলাম, নামিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডায় আমরা নাগাসাকির প্রায় অধিকাংশই ঘুরিয়া আসিলাম। তখন পথ ঘাট তৈয়ারী হইতেছে। সাধারণতঃ পথ তখন অপ্রশস্ত গলির মত ছিল। দু এক স্থলে তাহাই আরো প্রশস্ত করা হইতেছে দেখি। পথের দুই ধারে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী। বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদিগের কাজকর্ম্মের শৃঙ্খলা ও প্রণালী দেখিতে ঔৎসুক্য হইল। তবে কিছুতেই তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের সঙ্গে কোনও দোভাষীও ছিল না, সহর ঘুরিয়া একটা ভাব ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহারা খুব পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন জাতি। ইহাদের বাড়ীতে প্রবেশকালে জুতা খুলিয়াই যাওয়া বিধি। ঘরের মেঝে সবই বিচালি ও মাদুর দিয়া মোড়া। ইহারাও সব চীনাদের মতন একহাতে দুইটা কাঠি লইয়া ভাত তুলিয়া আহার করে। প্রধান আহার্য্য ভাত, শাকসবজী ও মাছ, খুব সামান্য রকমের। বেশ পরিশ্রমী জাত ও বংশানুক্রমে ইহারা এক ব্যবসায় চালায়। চীনাদের সহিত ইহাদের আচার গত ও বর্ণগত সৌসাদৃশ্য খুবই বর্ত্তমান, তবে ইহাদের চীনাদের মতন টিকি দেখি নাই। জাপানী জাঙ্গিয়া ও কিমোনো চীনেদের পায়জামা ও চীনে কোট হইতে অনেক বিভিন্ন। চীনেদের খাবার টেবিলের উপর একবারেই সাজাইয়া খাওয়া হয়। জাপানীদের আহারের সময় একজন পরিচারিকা পরিবেশন করে। চীনেরা বেঞ্চ বা টুলে উপবেশন করে, জাপানীরা আসনপিঁড়ি হইয়া বসে। চীনে-ভাষায় অহঙ্কার অধিক, জাপানী ভাষায় উহা নাই বলিলেই হয়।

জাপানী শিল্পকলা বেশ উন্নত ও নিজস্ব জাতীয় পরিচয়ে চিহ্নিত। বাঁশের জিনিষ, বেতের আসবাব, কাচের পাত্র ও খেলনা, কাঠের উপর বিচিত্র রংয়ের কাজ এই সমস্ত কারু শিল্প জাপানে প্রসিদ্ধ। গজদন্তের কারুকার্য্য ও মিনে করা কাজও বেশ দেখিয়াছি। জাপানের porcelain কাজও অতি নয়নরঞ্জন। জাপানীদের নিত্য ব্যবহার্য্যের মধ্যে কাগজ একটী প্রধান জিনিষ; উহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে কাগজ কোনও না কোনও প্রকারে ব্যবহার আছেই। রুমাল, টেবিলের ঢাকা, বাক্সের গেলাপ, বালিশের ওয়াড় সবরকম কাজেই কাগজ লাগে। সার্সিতে কাচের বদলে কাগজেই কাজ চলে। ঘরে ঘরে ব্যবধান কাগজে তৈয়ারি হয়। আবশ্যক হইলে সেই ব্যবধান আবার মুড়িয়া সরাইয়া রাখা হয়। বাজারে কাগজের ঠোঙ্গা খুব প্রচলিত।

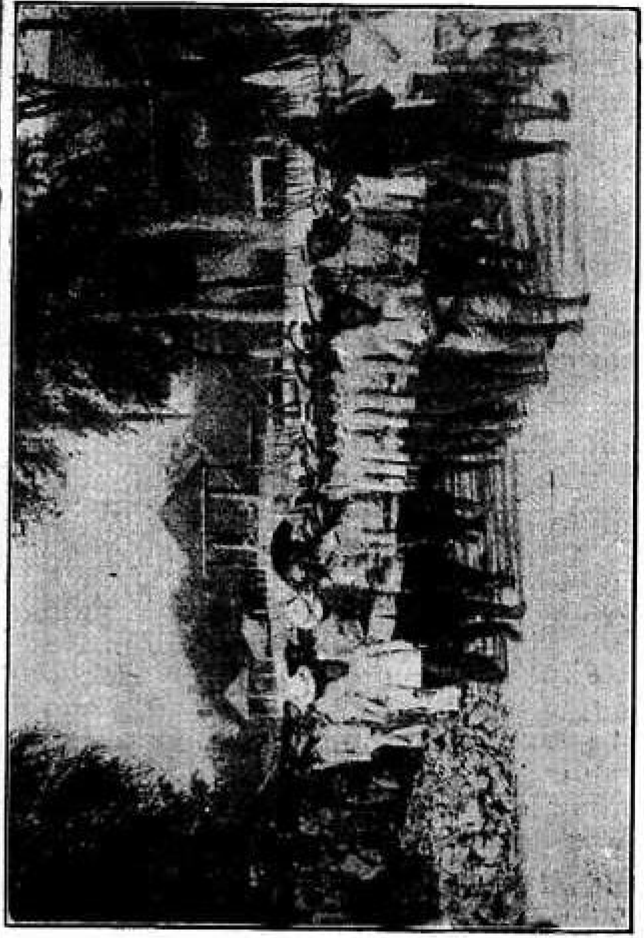
জাপানে কাঠের জুতা খুব ব্যবহৃত হয়। কাঠের জুতার স্থানীয় নাম "গেতা"। পূর্ব্বে বলিয়াছি চীনেরা চামড়ার ঘোড়তোলা চটী ব্যবহার করে। ইহাও একটী দুই জাতের বিভিন্নতার পরিচয়। দুইজন জাপানী সাক্ষাৎ হইলে মস্তক নত করিয়া সম্ভাষণ করে। চীনেদের মধ্যে সেরূপ কোনও প্রথা দেখি নাই। দুই জাতের মধ্যে জাপানীরা খুব মিতব্যয়ী। চীনাদের অপেক্ষা জাপানীরা মিশুক বেশী। জাপানে চাষের কার্য্য ঘোড়ায় করে, চীনে মহিষে লাঙ্গল টানে। রেলে যাইতে যাইতে দুইধারে বাঙ্গালা দেশের মত ধানক্ষেত দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশ্রম ও সামর্থ্যে জাপানীরা চীনাদের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। আমরা যখন প্রথম জাপান যাই তখন সে সময়ে এক একটী ছোট ছোট ঘরের

মধ্যে জাপানীদের পাঠশালা দেখিয়াছিলাম। আমাদের তাঁবুর কাজের জন্য যে ২।৪ জন লোকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল তাহাদিগকেও লিখিতে পড়িতে দেখিয়াছি মনে পড়ে।

জাপানের কোনও সহরের কোনও বিশেষত্ব দেখি নাই। আমরা ক্রমান্বয়ে এই সকল স্থানে আমাদের মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করাই। নাগাসাকি হইতে জাহাজে প্রথম কোবে যাই। কোবে হইতে ইয়কোহামাও জলপথ। তখন ইয়কোহামা হইতে ওসাকা হইয়া টোকিও পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল। আর সমস্ত জায়গায় আমরা রিক্শ চড়িয়া দল বাঁধিয়া যাইতাম। আমাদের মালপত্র হাত-ঠেলা মালগাড়ীতে করিয়া রওনা করিতাম। এখন অবশ্য জাপানে ৫৫০০ মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যখন প্রথম সেখানে যাই তখন সবে মাত্র হেমবাবুর "ভারত ভিক্ষায়" আমরা জাপানের কথা পাই। রুষ-জাপানের যুদ্ধের কথা তখনও কেহ হয়ত স্বপ্নেও দেখিবার কল্পনা করে নাই, ইংরাজের বন্ধুত্বের কথা ত স্বতন্ত্র। একথা বলিলে বোধ হয় আপনারা বিস্মিত হইবেন না যে আমার নিজের "অসভ্য জাপান"কে দেখিয়া অসভ্য বলিতে বা মনে করিতে ইচ্ছা হয় নাই। আমাদের খেলা দেখিতে আসিয়া তাহাদের যে ব্যবহার দেখিয়াছি, তাহাদের স্বদেশজাত রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের যে পরিচয় পাইয়াছি, মোটের উপর নিজেদের দেশ নিজেদের ঘরে বাহিরে তাহাদের যে সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য তাহাদের জীবন যাত্রায় আনুসঙ্গিকভাবে মিশ্রিত ছিল, তাহাতে তাহারা যে একটী স্বতন্ত্র দেশের স্বাধীন জাতি সে বিষয় ধারণা আমাদের সঙ্গে অন্য কেহ থাকিলে তাঁহারও হইত।

আপনারা আজকাল জাপানী যুযুৎসুর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। আমরা যখন প্রথম জাপান যাই, তখন যুযুৎসুর কথা কিছুই শুনি নাই। আমাদের সার্কাসে জাপানের সকল শ্রেণীর লোকই আসিত। সে সময়ে আমাদের বুদ্ধির অনুযায়ী কিছু একটা ওদেশে থাকিলে, আমরা সে বিষয় শুনিবার আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা সেরূপ কিছু শুনি নাই। আমার বোধ হয় যুযুৎসু জাপানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী-সমাজে অনুশীলনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার তত আদর ছিল না।

জাপানে প্রশংসার্হ কার্য্য দেখিয়া হাততালি দেওয়াও প্রচলিত আছে। আমাদের জাপান প্রবাসের সময় আমাদের দলের একজন মার্কিণ খেলোয়াড় মারা পড়েন। তাঁহার নাম ছিল Fred Lezie। ইনি ট্রাপিজে খেলা দেখাইতেন। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসরের বেশী হইবে না। যতদূর মনে পড়ে আমাদের শাংঘাই বাসের সময় ইনি আমাদের দলে যোগদান করেন। জাপানের উত্তর খণ্ডে যখন আমরা গমন করি সেই সময় তিনি হঠাৎ রোগাক্রান্ত হন। স্থানীয় জাপানী চিকিৎসককে দেখান হয়, কিন্তু তিনি চিকিৎসায় বড় কিছু উপকার পাইলেন না। ৫।৬ দিনের মধ্যে মৃত্যুর কবলে পড়িয়া যান। তিনি একজন Freemason ছিলেন। ইয়োকোহামাতে ফ্রিমেশন্‌দিগের একটা আড্ডা (lodge) ছিল। আমাদের কর্ত্তা উল্‌ম্যান সাহেব তাঁহাকে Coffinএ করিয়া ইয়োকোহামা লজ্‌এ লইয়া তাঁহার "মেশন্‌ ব্রাদার"দিগকে দেন। 'লজ্‌'এর 'ব্রাদার'রা



সামোয়া দেশীয় নর-খাদকের গ্রামবাস (৩২ বৎসর পূর্ব্বে) ১৮।

Mohila Press, Cal.

তাঁহার যথারীতি সংকার করিয়া আমাদের সমস্ত দলটিকে ইয়কোহামা আনিতে সমস্ত খরচ-খরচাদি দিয়া পাঠাইলেন। এই যে প্রীতির নিদর্শন ঐ 'লজ্'এর 'মেশনিক ব্রাদারহুড্'এর নিকট হইতে আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা তাঁহাদের ব্রাদার লেজ্লির শেষ জীবনের বান্ধবদিগের প্রতি শ্রদ্ধার অবদান। ইহা জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, রাষ্ট্র, সকল প্রকার ভেদের ব্যবধানকে ভুলাইয়া দিয়া মানুষে মানুষের মধ্যে সহজ সরল অনাবিল সখ্যের ভাবকেই অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও জাগাইয়া তোলে।

'লেজ্লি'র কাফিনের কথায় মনে পড়িয়া গেল জাপানীদের কফিন্ কিরূপ। জাপানীরা মৃতদেহ কফিনে শোয়াইয়া দেয় না, একটী বাক্সে বসাইয়া দেয়। লেজলি বেচারাকেও কফিনে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

আমরা ইয়কোহামা, কোবে, নাগাসাকি হইয়া একেবারে হংকং আসিয়া উঠিলাম। হংকংএ সেই Causeway Bayতে ৭ দিন ধরিয়া আবার আমাদের খেলা চলিল। আমরা আবার সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করিলাম। এই জলপথটী দুই দিন দুই রাত্রির পথ। আমরা প্রথম যাইয়া উঠিলাম ম্যানিলায়। ম্যানিলা সর্ব্বপ্রধান বন্দর ও সহর বলিলেই হয়। এখান হইতে বিখ্যাত দড়ি ও তামাক পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে প্রায়ই ভয়ানক ঝড় হয়। যখন ঝড়ের লক্ষণ বোধ হয় তখন আমরা তাঁবু নামাইয়া রাখিতাম। ফিলিপিনো জাতিদের এমন একটা অভিজ্ঞতা আছে যে, এক রকম মেঘ দেখিলেই তাহারা বলিতে পারে যে ঝড় উঠিবে। ফিলিপাইন

দ্বীপপুঞ্জে প্রকৃতির আর এক রকম নৃত্য আছে। প্রায়ই সেখানে ভূমিকম্প হয়। এইরূপ ভূমিকম্প কখনও কখনও ঘণ্টায় দুইবারও হয়। বলিতে ভুলিয়াছি জাপানেও প্রায় ভূমিকম্প হয়। সেইজন্য জাপানে কাঠের বাড়ী প্রচলিত। তবে ফিলিপাইনে ভূমিকম্পের প্রকোপ তদপেক্ষা অধিক বলিয়া এখানে মঁাচানের উপর ইহারা ঘর নির্ম্মাণ করে। ফিলিপাইনে তাল, নারিকেল, খেজুর, গাছ বিস্তর। এইরূপ নারিকেলের গুঁড়ি চারি কোনে চারিটী দিয়া ৬ ফুট কি ৮ ফুট উচ্চে ঘর থাকে। ভূমিকম্পের সময় সমস্ত ঘরগুলি দুলিতে থাকে, অথচ পড়িয়া যায় না। অনেক ঘর-ওয়ালা বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইলে চারিটির অধিক গুঁড়ি গাড়িতে হয়। বাড়ীগুলির দেওয়াল কাঠের ও ছাদ খোলার। মেঝে কাঠের—তাহাতে রং পালিশ করাও চলে।

ফিলিপিনোরা দেখিতে মলয়-দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীর ন্যায়। আহার, ব্যবহার, আকারাদিও অনেকটা যবদ্বীপ বাসীর ন্যায়। পুরুষরা পায়জামা ও সার্ট ব্যবহার করে। মেয়েদের পোষাক একটু বিভিন্ন রকমের। সারং পড়ে ও গায়ে জামা দেয়—সে জামা নিতান্ত এক অদ্ভুত রকমের। ভাত প্রধান আহার্য্য। পান খাওয়া খুব প্রচলিত, এমন কি বুড়া-বুড়ী হামানদিস্তায় পান ছেঁচিয়া খায়। মাছ, তরিতরকারি, মাংস, মুরগি-চলে। নারিকেল তেল ইহাদের রন্ধনে চলে।

মোরগের লড়াই দেখিবার সখ খুব। তাহা দেখাইয়া অনেকে জীবিকা-অর্জ্জন করে। আমরা প্রত্যেক সহরে ২।৩টি করিয়া Cockpit দেখিয়াছি। যখন সেখানে মোরগের লড়াই হয়

তখন ৩।৪ শত লোক জমায়েৎ হয়। লোকে উৎসাহে নানা প্রকার চীৎকার করিতে থাকে। বিলক্ষণ দলাদলিও থাকে এবং খেলায় বাজী রাখাও চলে। ইহাদের এই খেলার উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য মোরগের পায়ে ছুরিকা বাঁধিয়া দেয় এবং যতক্ষণ না একটী মোরগ রক্তাক্ত হইয়া মৃত বা মৃতবৎ হইয়া পড়ে ততক্ষণ লড়াই চলিতে থাকে। তাহার পর একটীকে পড়িতে দেখিয়া যদি অপরটী মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে যে চলিয়া গেল তাহারই পরাজয় হইল। যে মোরগ পরাজিত শত্রুর মৃত চক্ষুর দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিতে পারে সেই জিতিয়া যায়। জুয়াখেলাও একরকম উপজীবিকা। নারিকেলের কুরি হইতে নিংড়াইয়া দুধ বাহির করিয়া তাহা হইতে নারিকেল তৈল প্রস্তুত করা একরকম উপজীবিকা। স্থানীয় দড়ী ও চুরুট তৈয়ারী করাও একরকম ব্যবসায়। উহারা নিজেরাও যথেষ্ট চুরুট খায়। অনেক লোকে নৌকা চালাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। দ্বীপপুঞ্জে নৌকার প্রচলনও যথেষ্ট।

ফিলিপিনো স্ত্রী পুরুষ বিদেশীর সহিত খুব সমাদরের সহিত মেলামেশা করে। ইংরাজী জানা দোভাষীর সাহায্যে আমাদের কথা চালাইতে হইত। আমরা যখন প্রথম যাই তখন Spaniardরা ঐ দেশের মালিক। Spaniard দিগের সহিত ইহাদের কোনও প্রকার সদ্ভাবের অভাব আমরা দেখি নাই। Spaniardরা আমাদের সহিত খুব মেলামেশা করিয়াছিল এবং আমাদের ফিলিপাইন যাওয়াও আমাদের পক্ষে খুব লাভজনক হইয়াছিল।

ম্যানিলায় দুইটী সহর আছে। একটী কেল্লার ভিতর, আর
একটী কেল্লার বাহিরে। কেল্লাটী চারিটী ফটকওয়ালা প্রাচীর-
দ্বারা বেষ্টিত। কেল্লার ভিতর আফিস, আদালত, কোর্ট, হোটেল
এই সব আছে। কেল্লার বাহিরে সমুদ্রের কূলে একটী বেড়াইবার
স্থান আছে, সমস্ত সহরের লোক বৈকালে ঐখানে সান্ধ্য ভ্রমণের
জন্য আসে। সে জায়গাটাকে "লুনেটা" বলে। মধ্য স্থানে একটী
Band-stand আছে ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বসিবার জন্য কতকগুলি
বেঞ্চ পাতা আছে। লুনেটার একপার্শ্বে একটী খাল আছে। সেই
খালের উপর পুল পার হইয়া সহরে যাইতে হয়। ঐ বাহিরের
সহরটী আকারে বৃহত্তর ও অধিক লোকের বাস ঐখানেই।
রাস্তা ঘাটে গ্যাসের আলো, কলের জল, বাঁধান ড্রেন দেখিয়াছি।
আমরা ঐ বড় সহরেই বিলিবিড নামক পল্লিতে তাঁবু গাড়িয়া-
ছিলাম। বিলিবিড সেখানকার জেলখানার নাম। যবদ্বীপের
কয়েদিদিগের মতন এখানকার কয়েদিরাও জেলখানার বাহিরে
সর্দারের অধীনে মজুর খাটে। রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, জমি চৌরস
করা, পথ ঘাট তৈয়ারী করা, সাধারণ পূর্ত্তকার্য্য ইহাদের দ্বারা
সম্পন্ন হয়।

ম্যানিলায় Bull fight বা ষাঁড়ের লড়াই হয়। প্রায় প্রতি রবিবারেই হয়। স্থানীয় স্পেনবাসীরাই এই ব্যাপারের প্রদর্শক। Circusএর মল্লভূমির চতুর্গুণ খানিকটা খোলা জায়গায় এই খেলা হয়। এই খোলা জায়গার মধ্য স্থানে আবার একটী বেড়া দেওয়া জায়গা থাকে। ভয়ানক বিপদ সঙ্কুল অবস্থা ঘটিলে খেলোয়াড়রা বেড়া ডিঙ্গাইয়া সেইখানে পালাইয়া আত্ম-

রক্ষা করে। এই খোলা জায়গার চারিদিকে বেড়া। তাহার চতুষ্পার্শ্বে দর্শকদিগের দেখিবার জন্য গ্যালারী—রোমানদিগের Amphitheatreএর মতন অনেকটা। প্রথমতঃ তোরাদোররা ৪।৫ জন আসিয়া একটা ষাঁড়কে ঐ মল্লভূমিতে লইয়া আসে ও তাহাকে লাঠির খোঁচা মারিয়া উত্যক্ত করে। যখন সে উত্যক্ত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া তাহার আততায়ীদিগকে তাড়া করিতে থাকে তখন অপর ৪।৫ জন আসিয়া বড় লোহার ফলা দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিতে থাকে। এই সকল লোহার ফলার মুখগুলি বঁড়সির মতন দুমুখো অর্থাৎ নড়িলে চড়িলেই যন্ত্রণা দিতে থাকে। এই দলটীকে "মাতাদোর" বলে। এইরূপে ষাঁড় যখন উন্মাদের মতন বা বন্যবরাহের মতন যাহা কিছু সম্মুখে দেখে তাহাই তাহার শৃঙ্গাঘাতে উপাড়িয়া ফেলিবার জন্য ক্রোধে ছুটাছুটি করিতে থাকে তখন পিকাদোর বর্শা হস্তে তাহার সম্মুখীন হইয়া একঘায়ে তাহাকে নিহত করে। শুনিয়াছি অনেক সময় পিকাদোরকে ষাঁড়ের গুঁতা খাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইয়াছে। প্রথম দিন রক্ত স্রোতের এই বীভৎস নৃশংস দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যে শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজও আমার মনে আছে। তথাকার লোকের উৎসাহ ও উত্তেজনায় পর পরদিন ততটা শিহরিয়া উঠি নাই বটে কিন্তু কখনও সে উৎসাহে যোগদান করিতে পারি নাই। পিকাদোর জয়ী হইলে দর্শকেরা তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ রুমাল, টাকা, পয়সা, টুপি প্রভৃতি ছুঁড়িয়া দেয়। আর নিহত ষাঁড়টীকে ৪।৫ জন অশ্বারোহী হিঁচড়াইয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়।

ম্যানিলা হইতে ছোট ষ্টীমারে করিয়া আমরা ঐ দ্বীপপুঞ্জের আরও চারিটী বন্দরে যাই। সেগুলির নাম, হিলোহিলো, সিবো, পাম্পাঙ্গা ও নিপা। এগুলি ঠিক সহরের মতন নহে। রাস্তা কাঁচা ও দৃশ্যটী অনেকটা পল্লীগ্রামের মতন। নারিকেল, সুপারী, কলা, পেঁপে, গোঁড়ানেবু পাওয়া যায়। আর এক রকম ফল পাওয়া যায়, তাহার নাম ডুরিয়ন। দেখিতে ছোট কাঁঠালের মতন কিন্তু ভিতরের কোয়াগুলি কাঁঠালের মতন নহে। ভাঙ্গিলে কাঁঠালের অপেক্ষা একটা তীব্র গন্ধ বাহির হয় ও ফলগুলি খুব মিষ্ট।

আমরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মোট তিন মাস থাকি। ইহা হইতে বুঝিবেন আমাদের খেলা কতটা আদর পাইয়াছিল।

ফিলিপাইন হইতে ফিরিয়া পুনরায় হংকং যাই। হংকং এ চীনেদের একটা থিয়েটার ভূমি আছে। সেইখানে আমাদের খেলা হইতে থাকে। এইখানে চীনেদের থিয়েটারটা কি, তাহা বলিয়া দিই। একটা দর্শকদের বসিবার স্থান থাকে, তাহার সম্মুখে একটী উচ্চ রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চে কোনও দৃশ্যপট নাই, কেবল একটী বোর্ড থাকে তাহাতে কি দৃশ্য কল্পনা করিতে হইবে তাহা লিখিয়া দেওয়া হয়। মনে করুন রাস্তার কল্পনা করা আবশ্যক সেই বোর্ডে রাস্তা লিখিয়া দেওয়া হয়। দর্শক মানস চক্ষে একটী রাস্তা দেখিয়া অভিনেতৃদিগের সংযোগ স্থল রাস্তা তাহা বুঝিয়া লয়।

হংকংএ আমি Abel সাহেবের দল ছাড়িয়া দিই। একটী ফরাসী ষ্টীমারে করিয়া, কলিকাতায় আসিবার মানস করিয়া সিঙ্গাপুরে নামিয়া পড়ি। সিঙ্গাপুরে নামিয়া দৈবক্রমে Woodyer

সাহেবের সহিত দেখা হয়। Woodyer আর একটী Circus পার্টির নেতা। Woodyer একজন Australia বাসী। তিনি আমায় দেখিয়াই তাহার দলে যোগদান করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার দল সুমাত্রায় ডেলী সহরে খেলা দেখাইতেছিল। আমি তাঁহার নির্দেশ মত তৎক্ষণাৎ ডেলীতে যাত্রা করিলাম। ডেলী সুমাত্রার অন্তরে, উপকূল হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা রেলপথে যাইতে হয়। সুমাত্রার লোক জনের আকার প্রকার, আচার ব্যবহার সমস্ত যবদ্বাসিদিগের ন্যায়।

ডেলী হইতে বিঞ্জি বলিয়া আর একটী সহর হইয়া আমরা পিনাং আসি। পিনাং ও রেঙ্গুনে খেলা দেখাইয়া আমরা কলিকাতায় আসিলাম। তখন কলিকাতায় খেলার মরসুম অর্থাৎ শীতকাল।

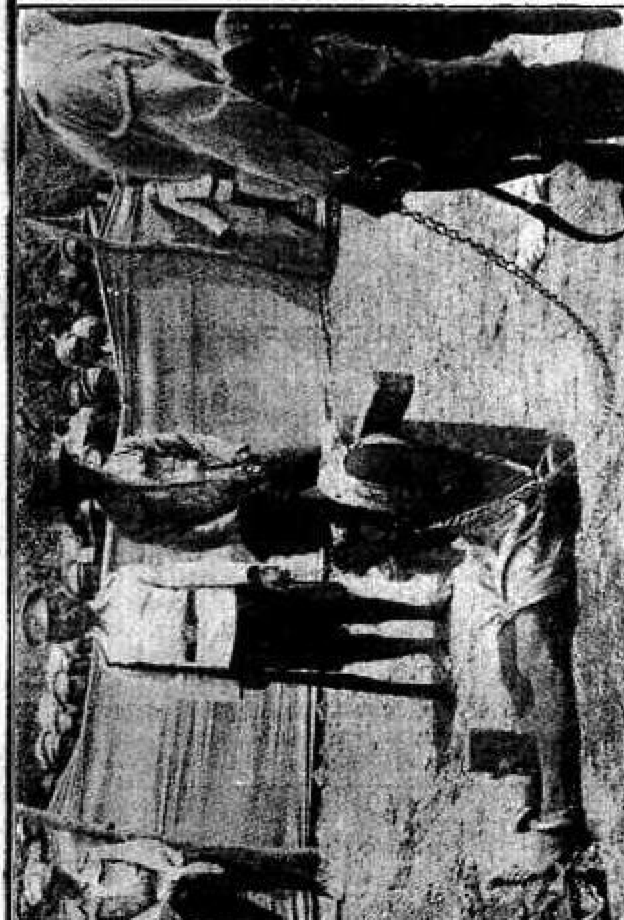
পঞ্চম অধ্যায়

বিদেশে কর্ম্মজীবন

প্রথম যখন হরিমোহন রায়ের বাড়ীতে খেলা দেখাইয়া Harringtonএর সঙ্গে চট্টগ্রাম যাইবার জন্য প্রস্তুত হই সে আজ তিন বৎসরের অধিক হইবে। ইহার মধ্যে নিতাই horizontal barএর ও ringএর খেলা করিয়া করিয়া ঐ দুই খেলায় নানা প্রকার কৌশলের ক্রীড়া শিখিয়া লইয়াছিলাম। Woodyer এর দলে ঐ সকল খেলা দেখাইবার আর কোনও লোক ছিল না। কাজেই আমার যোগদানে ঐ দলের লাভ হইল। একদিকে এই এক কথা।

অপরদিকে Wooyerএর দল বেশ বড় দল ছিল। নানা প্রকারের খেলোয়ার নানা প্রকার ক্রীড়া কৌশল দেখাইত। ঘোড়ার খেলায় তিনজন লোক বেশ কৃতী ছিল। এই তিনজনের মধ্যে একজন একটী অষ্ট্রেলিয়ার নারী। এই সকল কৃতী-কৌশলীদিগের ভিতর আমার স্থান বেশ সম্মানের বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেটা উভয়তঃই।

Woodyer সাহেব কলিকাতায় আসিয়া বেশ উৎসাহের সহিত খেলা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ১ সপ্তাহ খেলা হইবার পরই হঠাৎ তাঁহার ওলাউঠা হওয়ায় তিনি ১ দিনের রোগেই মারা পড়েন। তাঁহার সম্মানে ১ দিন আমাদের খেলা বন্ধরাখা



স্যাম দেশীয় নর-ঘাতকের প্রাণদণ্ড (৩৫ বৎসর পূর্ব্বে) ২য়।

Mohila Press, Cal.

হয়। এবং আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করি। Woodyer সাহেবের মেম Circusএর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করাতে পরদিন হইতে আবার রীতিমত খেলা চলিতে লাগিল।

এই Woodyer Circusএ আমি প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ছিলাম। আমার নিজের খেলার বিষয়ে এই Circusএ থাকা-কালীন অনেক উন্নতিলাভ করি। বর্ম্মা মলয়দ্বীপপুঞ্জে ও ভারতবর্ষের অনেক অনেক স্থানে আমরা এই সময় ঘুরি। অধিকাংশ স্থান আমার পূর্ব্ব পরিচিত। যে কয়টী নূতন স্থানে গিয়াছিলাম তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

আমরা কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে যাই। মাদ্রাজ তখন আমার নিকট একটা বিভিন্ন দেশ বলিলেই হয়। আকৃতি আচার ব্যবহার ভাষা সব বিষয়েই আমি অনভ্যস্ত এবং তখন কলিকাতা হইতে যাওয়া আসার সুবিধাও তত ছিল না। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কল্পনাও তখন হয় নাই।

সুমাত্রায় দুইটী নূতন জায়গায় যাই। সে দুটীর নাম ওলেনা ও কোতোরাজা। দুইটাই বড় বড় ধনী কৃষকদিগের আড্ডা। ছোট ছোট পল্লী বলিলেই হয় অথচ আমাদের আদর যত্ন খুবই হইয়াছিল। আমরা এখানে নিখরচায় তাঁবুর স্থান পাই।

এবার সেলিবিস দ্বীপের প্রধান সহর মাকাসারে যাই। মাকাসারের অধিবাসীরা দেখিতে-শুনিতে যবদ্বীপীদিগের ন্যায়। এখানে চীনেরা প্রায় সমস্ত দোকানের মালিক। মাকাসারে অনেক রকম পাখী পাওয়া যায়। কাকাতুয়া, হীরামণ, চন্দনা,

লালমোহন প্রভৃতি জাতীয় পক্ষী ঐখানে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখিয়াছি। স্থানটী বৃক্ষ-পল্লব লতা গুল্মে মণ্ডিত বলিলেই হয়।

বর্ম্মা ভ্রমণকালে মাণ্ডালয়, পেগু ও মৌলমিন যাই, এই তিনটীর মধ্যে মাণ্ডালয় বেশ বড় জায়গা। চতুষ্কোণ মাণ্ডালয় সহরের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর আছে। প্রাচীরটী ২৭ ফুট উচ্চ ও প্রায় ২ হাত চওড়া হইবে। প্রতি পার্শ্বে তিনটী করিয়া বারটী ফটক। প্রাচীরের বাহিরে ১০০ ফিট চওড়া একটী পরিখা বেষ্টন করিয়া আছে। এবং ৫টী সেতু দ্বারা এই পরিখা পার হইয়া সহরে যাতায়াত করিতে হয়।

মান্দালয়ে বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব নৃপতিদিগের প্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান। প্রাসাদে নানা প্রকার মণিখচিত সভাগৃহ ও কক্ষ আছে। দেখিলে রাজোচিত মনে হয়।

প্যাগোডা বর্ম্মনদিগের সকল সহরেই থাকে। মান্দালয়েও এক বিখ্যাত প্যাগোডা দেখিয়াছি বটে কিন্তু আজ তাহার বিশেষত্ব মনে পড়ে না। বর্ম্মা বাসকালে বর্ম্মীদিগের এক অদ্ভুত আচার দেখিয়াছি। রাত্রে যখন তাহারা পথেচলে তাহারা একটী করিয়া বর্ত্তমান কলার ন্যায় মোটা চুরুট মুখে করিয়া চলে। এই চুরুট গৃহজাত সামগ্রী। এক একটী টানে চুরুটের মুখটী প্রজ্বলিত হইয়া যে আলোক হয় তাহাতে দূরস্থ পথিকের চক্ষে ঠেকে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড আসিতেছে।

বলিতে ভুলিয়াছি প্রথমবার যখন বর্ম্মায় আসিয়াছিলাম তখন বর্ম্মার উত্তর ভাগ ইংরাজের শাসনে আসে নাই। এইবার

বর্ম্মায় যাই লর্ড ডফ্‌রিণের বর্ম্মা বিজয়ের পরে। কাজেই উত্তর বর্ম্মা এখন ইংরাজের করায়ত্ত।

এইবার ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হংকংএ যাই তখন Harmstone Circus ফিলিপাইন দ্বীপুঞ্জ হইতে আসিয়া হংকংএ আমায় তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লয়। সেটা ১৮৯২ সালের মে মাসের শেষাশেষি।

Harmstoneএর দলে ভিড়িয়া আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর বিভিন্ন দেশে খেলা দেখাই। এই পাঁচবৎসর আমরা পূর্ব্ব এসিয়া, মলয়দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও অষ্ট্রেলিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি ও ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছি। যে কয়টী নূতন স্থানে গিয়াছিলাম তাহাদের কিছু কিছু পরিচয় দি।

যবদ্বীপে যে কয়টী নূতন স্থানে গিয়াছিলাম তাহাদের নাম মালাং, যোজকোর্ত্তা, কেদেরী, মিদিওন, সোলো ও চেরিবোন। ইহাদের মধ্যে চেরিবোন একটী সমুদ্রকূলের বন্দর আর সবই গ্রাম বলিলেই হয়। চেরিবোনে সমুদ্রকূলে বিস্তর কিস্তি দেখিয়াছি এবং সম্ভবতঃ খুব বাণিজ্য-প্রধান বন্দর।

যব হইতে সুমাত্রায় যাই। সুমাত্রায় পাডাং ও আচীন দুইটি সহর; কিন্তু অনতিবহুল লোকের বাস। অধিবাসীদিগের সহিত যববাসীদিগের সব রকমেরই সৌসাদৃশ্য আছে। বোর্ণিও, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সেলেবিস দ্বীপের অধিবাসীরা সব একজাতি বলিলেই হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানে সম্বন্ধ যুক্ত।

Harmstoneএর দলের সহিত একবার সায়গণে যাই। সায়গণ আনামের প্রধান বন্দর। সমুদ্র কূল হইতে অনতিদূরে কাম্বোডিয়া

নদীর উপর অবস্থিত। ইহা ফরাসী জাতির উপনিবেশ। সহরটী প্রাচীন সহর। তবে এখন অনেক ইউরোপীয়ের বাস। ফরাসী যোদ্ধা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। একজন ফরাসী গবর্ণর থাকেন। বাজার একটী আছে, তাহা বেশ বড়। আদিম অধিবাসী শ্যামবাসী। ইহারা ইজের জামা পরিধান করে। মেয়েরা সারং ও জামা পরে। মেয়ে পুরুষ সকলেই জুতা পায়ে দেয়। ইহারা মাছ ভাত খায়। মাচানের উপর ইহাদের ঘর বাড়ি তৈয়ারি হয়। জুয়া খেলায় ইহারা উন্মত্ত থাকে। কিন্তু ইহাদের কোনও প্রকার মাদক সেবন করিতে দেখি নাই। চুরুটটা চলে। চা কফি পানেও অভ্যস্ত। ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্‌শ প্রচলিত। মাল সব মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। সায়গণে নাখোদাদের দোকান দেখিয়াছি। ভারতজাত সকল রকম জিনিষ তাঁহারা ঐ দূরদেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যান। আর আছে ফরাসী সওদাগরদিগের দোকান পাট। দুই একটা ব্যাঙ্কে ইংরাজ কর্ম্মচারী আছে।

আমাদের খেলা দেখিতে সকল জাতের বাসিন্দারই শুভাগমন হইত। সেবার একমাস তথায় ছিলাম। আমাদের তাঁবুতে লোকের অভাব হইত না। যখন সায়গণে খেলা দেখান চলিতেছিল তখন আমার নিজের খেলায় আমি বিশেষ সুকৌশলী হইয়া উঠিয়াছিলাম। সায়গণে আমার অদৃষ্টে বহু প্রশংসা লাভ হইয়াছিল।

সায়গণ হইতে চীনদেশের কয়েকস্থানে যাই। সে সব স্থানের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। এবার যখন জাপানে যাইলাম তখন দেখি জাপানটাকে যেন ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইতেছে। সেটা ধরুণ ১৮৯৪ সালের কথা। পথ ঘাট সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রশস্ত

করিয়া সাজান হইতেছে। রাস্তার ধারের নূতন কাঠের বাড়িগুলি সুসংস্কৃত হইতেছে। তখন একটা বড় কলেজ তৈয়ারি হইতেছিল। প্রথমবার যখন যাই তখন জাপানে সংবাদ পত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এবার গিয়া অনেক সংবাদপত্র দেখি এবং সেই সকল সংবাদপত্রে আমাদের Circusএর আলোচনা হইত এবং আমরাও বিজ্ঞাপন প্রচার করিতাম। এ বিষয় তখন বেশ আগ্রহও দেখিয়াছিলাম। ইহার পর বারে যখন আবার জাপানে গিয়াছিলাম তখন আবার সংবাদপত্রের সংবাদদাতা (reporter) দিগকে লইয়া এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলাম। সে সময় আরও দুই একটা নূতন থিয়েটার দেখিয়াছিলাম।

টোকিওতে যখন যাই তখন কেবলমাত্র টোকিওতে খেলা শেষ হইল না। টোকিওর মধ্যে শিবা বলিয়া একটা বিখ্যাত উদ্যান আছে। শিবা লম্বায় ও চওড়ায় ১॥০ পোয়া হইবে। এই উদ্যানের মধ্যে নানাপ্রকার সাজান প্রদর্শনী খোলা আছে। দিনের বেলা বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এই শিবার বাগানে দলে দলে জাপানী যুবক যুবতী বালক বালিকা পরিভ্রমণ করিতে যায়। মধ্যে মধ্যে চেরী পুষ্পের কুঞ্জ সাজান আছে ও পুষ্পভারাবনত চেরীর ডালপালা নীচে ফুলের সৌরভে সৌরভিত বেঞ্চে লোক বিশ্রাম করে। শিবার মধ্যে অনেক মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে সোপান ও সোপানের দুইধারে এক একটী বসিবার স্থান ও তৎপার্শ্বে দোকান আছে। পূজার্থীরা যাইয়া বাক্সর ভিতর পূজার্থ কিঞ্চিৎ দক্ষিণাস্বরূপ দান করে ও প্রলম্বিত ঘণ্টার শিকলটী টানিয়া বাজাইয়া আসে।

আমরা এই শিবার উদ্যানেও তাঁবু গাড়িয়াছিলাম। আমাদের পক্ষে বেশ লাভজনক হইয়াছিল।

শিবা হইতে ইয়কোহামা যাইয়া আমাদের দলের মধ্যে একটী শুভকার্য্য হয়। Gilbert বলিয়া Harmstone সাহেবের একটী step-child ছিল। Gilbert বেশ সুকৌশলী ঘোড়শোয়ার ছিল। তখন তাহার বয়স ২২ বৎসর হইবে। সেই সময় Blanche বলিয়া একটী ইংরাজ কিশোরীও ঘোড়ার খেলা করিত। এই দুইটী কিশোর কিশোরীর উদ্বাহ হয় ইয়াকোহামাতে। তথাকার প্রায় ২০ জন ইংরাজ অধিবাসী ঐ বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়। গির্জ্জায় বিবাহ হইবার পর বেলা ১১টার সময় একটী ভোজে আমরা সকলে যোগদান করি। সেদিন আমাদের Circusএর খেলা বন্ধ থাকে। আমাদের নটলীলার মধ্যে সংসারের স্নেহমায়ার বন্ধনের ছবি একটু নূতন বৈচিত্র নূতন রসাস্বাদের অবসর প্রদান করিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

ইহার পরে হংকং হইয়া আমরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেতে যাই। এবারে ম্যানিলা হইয়া তাহার পর মালাবনে যাই। মালাবন স্পেনিয় সেনার বাসস্থান। এখানকার ক্যান্টনমেন্ট সহরের মতন।

এবার সিঙ্গাপুরে খেলা দেখাইবার সময় তথাকার টাউনহলে দুইরাত্রি আমাদের খেলা হয়। সিঙ্গাপুরের একদল সম্ভ্রান্ত লোক আছেন যাঁহারা আমাদের তাঁবুতে খেলা দেখিতে আসিতেন না। আমরা টাউন হলে যাইয়া সেই সমস্ত শ্রেণীর অনেককেই দর্শকরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমাদের পেশার লোকের মন বুঝিয়া

চলিতে শেখা চাইই; সেইজন্য অনেক স্থলে অনেক রকমে আমাদের লোকপ্রিয়তার খাতির করিতে হইয়াছে। লোকের রুচি ভিন্ন, মত ভিন্ন, পদমর্য্যাদা-জ্ঞান ভিন্ন এবং অবস্থা বিশেষে ও স্থান বিশেষে মনেরও পরিবর্ত্তন হয় ইহা আমাদিগকে নিত্য স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে হয়।

এবার যবদ্বীপে যাইয়া আর দুইটী নূতন জায়গায় যাই সে দুইটীর নাম পেকালো গণ ও টিগাল। এই দুইটী ছোট ছোট বন্দর। আর কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাই।

১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগে আমরা বাঙ্গালোরে যাই। বাঙ্গালোর বহু পেন্সনভোগীর বাসস্থান। পাহাড়ঘেরা মনোরম স্থান। ফল তরিতরকারি প্রচুর পাওয়া যায়। পথগুলি ছায়ায় ছায়ায় শীতল। গোরা-ব্যারিক আছে। গৃহ সমস্তই বাঙ্গলোর মতন ও উদ্যান বাটিকা। স্থানটী স্বাস্থ্যকর বলিয়া বেশ খ্যাতি আছে।

এদিক হইতে আবার আমরা যবদ্বীপে যাই। পুরাতন পরিচিত সকল স্থানে গিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত মালং, ব্লিটার, জোদ্জা এই তিনটী নূতন জায়গায় যাই। তিনটীই ছোট ছোট সহর।

আমাদের যবভ্রমণ অনেক বার হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যবদ্বীপবাসীরা আমোদ আহ্লাদে কত পয়সা খরচ করে।

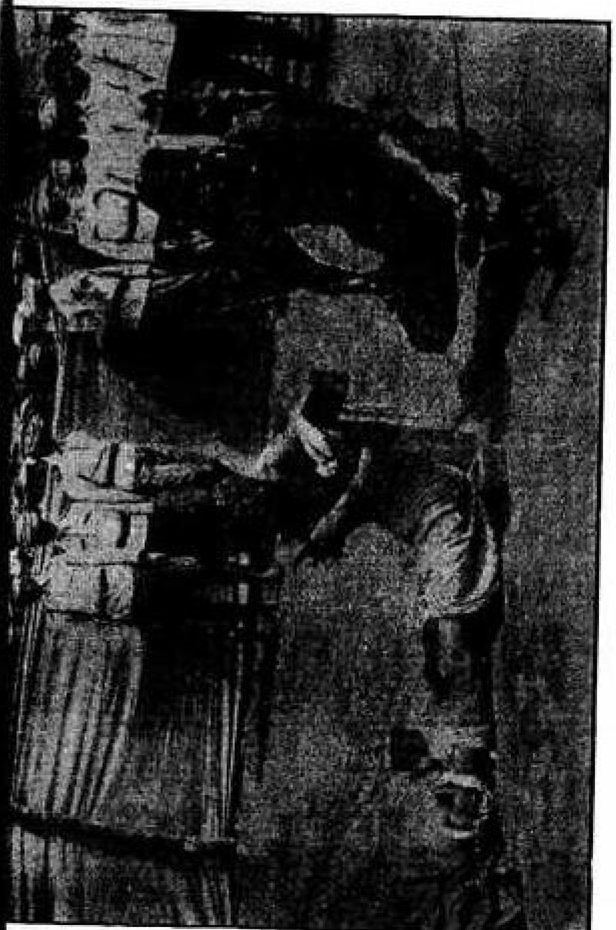
১৮৯৭ সালের ১৪ই নভেম্বর সিঙ্গাপুর হইতে আমরা প্রথম অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। Harmstone সাহেব তখন

মারা গিয়াছেন। Mrs. Harmstone তখন আমাদের দলের নেত্রী।

১৪ দিন একাদিক্রমে সমুদ্রপথে যাইয়া আমরা অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম বন্দর Albanyতে যাই। সমস্ত পথটী যেন পুষ্করিণীর উপর; ছোট জালিবোটে করিয়া ভাসিয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোনও দিন ঝড়-ঝাপটা বা বৃষ্টি কিছুই ভোগ করি নাই।

Albany ও তাহার পর Adelaide এক একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসি। Melbourne বড় সহর বলিয়া সেইখানেই প্রথম খেলা দেখান আমাদের অভিপ্রেত ছিল। ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে আমরা মেলবোর্ণে জাহাজ ত্যাগ করিলাম।

আমি একটু ভয়ে ভয়ে সহরে নামিলাম। আমার ভয় ছিল হয়ত কালা ভারতবাসী বলিয়া আমায় একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। কিন্তু দিন দুই থাকিবার পর বুঝিলাম আমি একেলা যাইলে কি হইত বলা যায় না তবে আমাকে সে সময় কোনও কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমাদের লোক-লস্করও সব ভারতবাসী ছিল তাহাদেরও কোনও প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। আমরা যে সময় যাই তাহার বৎসর কয়েক পরে অনকয়েক ভারতবাসী যাইয়া তথাকার রাস্তায় ফেরি করিতে আরম্ভ করে। এইসকল ফেরিওয়ালাদিগের আচার-ব্যবহার স্থানীয় অধিবাসীরা পছন্দ করে নাই। তাহার পরেই ভারতবাসীর যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ হয় এবং চীনবাসীরা ১০০ পাউণ্ড জিজিয়া দিয়া তবে সেখানে স্থান পায়। ইহাকে জাতিভেদজ্ঞানই বলুন, আর জাত্যভিমানই বলুন, আর জাতির স্পর্দ্ধাই বলুন, ইহা একটা



[illegible] দেশীয় নট-চাক্করের ফটোগ্রাফ (৩৫ বৎসর পূর্ব্বে) ।

Mohila Press. Cal.

আছেই। আমায় তখন দৈবক্রমে ভোগ করিতে হয় নাই তাহার যে কোন কারণই থাকুক না, এখন এই নিয়ম খুব প্রবল। কালা আদমীর স্থান অষ্ট্রেলিয়ায় নাই।

মেলবোর্ণ খুব আধুনিক সহর। শুনিয়াছি এই সহরের বয়স গোটা ৫০ বৎসর। সুতরাং আধুনিক সভ্যতার সকল অঙ্গ বর্ত্তমান। রাস্তার দুইধারে ফুটপাথ লইয়া ৭০ ফুট চওড়া হইবে। গ্যাসের আলো, কলের জল, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ি, এই সবে রাস্তা বেশ জমজমাট।

দুই ধারে অধিকাংশ বাড়িই দোতলা। বাড়ির ছাদ সব ঢালু। উহাদের বাড়িতে বারাণ্ডা নাই বলিলেই হয়। দেওয়ালের ভিতর দিকে হয় রং করা না হয় কাগজ মারা। মেঝে নারিকেল চট বা কাপড় বিছান। টেবিল, চেয়ার, কোচ, সোফা, আলমারি, আলনা, ছবি প্রভৃতি আসবাব যাহা এখানে সাহেববাড়ীতে দেখা যায়, তাহারাও সেই সব আসবাব ব্যবহার করে। ডাকঘর, তারঘর, বাজার, থিয়েটার প্রভৃতি সবই আছে। এক রাস্তায় চারিটী থিয়েটার দেখিয়াছি।

মেলবোর্ণে Chamber of Horrors বলিয়া এক রকম যাদুঘর আছে। তথায় খুনে, ডাকাত প্রভৃতি মানবসমাজের আততায়ীদিগের দুর্বৃত্ততার কাহিনী মোম নির্ম্মিত পুতুলে সাজান আছে। একটা চীনে দস্যু একটী নিদ্রিতা রমণীর গলা ছুরি দিয়া কাটিতে যাইতেছে। একজন হতভাগা স্বামী তাহার স্ত্রীকে প্রায়ই মারধর করিত। তাহার স্ত্রীর কপালে, কপোলে, চিবুকে মারের চিহ্ন, অবশেষে মার খাইতে খাইতে তাহার জীবন বাহির

হইয়া গেল। মাতার মৃতদেহের পার্শ্বে দুইটী সন্তান ভয়চকিত হইয়া বসিয়া আছে ও পার্শ্বে দুর্ব্বৃত্ত স্বামী দণ্ডায়মান। এইরূপ অসংখ্য পুতুলে ঐ Chamber পরিপূর্ণ। আমি ভারতবাসী—বাঙ্গালী। আমার নিকট এইরূপ বীভৎসরসের মূর্ত্তিগুলি অষ্ট্রেলীয়াবাসীর মনস্তত্ত্বের এক নিভৃত কোণের যবনিকা উত্তোলিত করিয়া দিল। মনে পড়িল, অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বীপান্তরিত সমাজদ্রোহীর আদিম বাস। মাতাল মাতালকে দেখিয়া একটু নাক সিট্‌কাইয়া মুখ ফিরায়, কেরোসিন তৈলের আত্মহত্যার কাহিনী প্রথম প্রচারিত হইলে আমাদের সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া ছিল। এসব সত্য হইলেও মনে খট্‌কা ঠেকে পাপপ্রবৃত্তি দমনের জন্য তাহার ভীষণ পরিণামের নিদর্শনকে জাগাইয়া রাখাই কি প্রকৃষ্ট উপায়, না দয়াধর্ম্মের জাগরণের জন্য দয়ার পাত্রই প্রধান প্ররোচনা ! বীভৎসের যাদুঘর দেখিলাম, মহত্ত্বের কাহিনী ত শুনিলাম না !!

মেলবোর্ণ যে নদীর উপর অবস্থিত তাহার নাম ইয়ারা। ইয়ারা আমাদের কলিকাতার মানিকতলা-খালের মত প্রশস্ত হইবে। তবে নৌকা ষ্টিমার যথেষ্ট যাতায়াত করে।

আমাকে লইয়া তথাকার ইংরাজ অধিবাসীরা তাহাদের অনেক কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিল। আমাদের দেশে নদী, পাহাড় আছে কি না তাহাও তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এবং সে সব তাহাদেরই দেশের মত আছে শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিত। আমার ভাগ্যে আতিথেয়তা লাভও ঘটিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া তাহাদের প্রদত্ত চা পান করিতে করিতে এই সব গল্প হইত। আমাদের সার্কাসের খেলার কথাও উঠিত। তথাকার খবরের

কাগজেও আমাদের দলের খেলার প্রশংসা বাহির হইত। আমায় অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমার মত আর কোনও ভারতবাসী এই সব বিষয়ে দক্ষ কি না। আমার ন্যায় আরো ভারতবাসী আছে শুনিলে চুপ করিয়া যাইত।

মেলবোর্ণে ছয় সপ্তাহ খেলা দেখাইয়া আমরা টাসমেনিয়ার লন্‌সেষ্টন ও হোবার্ট সহর যাই। দুইটীই ছোট ছোট সহর। নূতন কিছুই দেখি নাই। দুই সপ্তাহ দুই জায়গায় কাটাইয়া আবার অষ্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসলে আসি। উটী একটী সমুদ্রকূলের বন্দর মাত্র। ইহার পরে ১০ মাস ধরিয়া অষ্ট্রেলিয়ার নানা ছোট বড় সহরে আমরা তাঁবু ফেলি। নূতন বড় কিছু দেখি নাই। তাই কেবল নামগুলি দিলাম। নিউক্যাসেল হইতে যথাক্রমে ব্রিসবেন, সিডনি, এডিলেড, ব্রোকনহিল, পিটার্স্‌বার্গ, জেমস্‌টাউন, গ্ল্যাডষ্টোন, পোর্টপিরি, কাদিনা, বালাক্ল, মুন্টা, পোর্ট এডিলেড, জিলং, ক্যাম্পারডাউন, বারণবুল, হ্যামিল্টন, আলারাট, বালারাট, মেরিবরো, ক্যাসল্‌মেন, বেণ্ডিগো, সেমুর, য়ুরোয়া, বেনালা, বিচ্‌ওয়ার্থ, ব্রাইট, মার্টলফোর্ড, করোয়া, রাদারগ্লেন, চিল্টার্ণ, আলবেরি, বাগাবাগা, কুটুমুণ্ড্রা, ইয়ং, কাওরা, অরেঞ্জ, ব্যাথর্ষ্ট, পারামাটা, পুনরায় সিডনি এই সকল স্থানে খেলা দেখাইতে যাই। মোটের উপর আমাদের অষ্ট্রেলিয়া বাস লাভজনক হয় নাই। বেদিয়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইলে ও অবসর মাফিক প্রদর্শনী খুলিলে সে দেশে বড় একটা লোকের মন মজে না, সেখানকার স্থায়ী সার্কাসের দল যাঁহারা আছেন তাঁহারা যখনই যেখানে যান তখনই প্রত্যহ খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন। আমাদের অপেক্ষা

তাহাদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য অনেক নীচ পর্য্যায়ের, কিন্তু তাঁহারা অধিবাসীদিগের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিজেদের জিড়াইয়া লইতে পারেন বলিয়া আমাদিগের অপেক্ষা অর্থবিষয়ে অধিকতর ভাগ্যবান। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন লোক, ভিন্ন রুচি। আমাদের অভিজ্ঞতাটুকুই আমাদের লাভ।

আমরা যখন Harmstoneর দলে পূর্ব্ব এশিয়ায় ঘুরিতেছিলাম, সেই সময় Warren বলিয়া একজন মার্কিনী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে লইয়া আমাদের Circusএ আসিয়া যোগদান করেন। যখন আমাদের অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে আমরা কতকটা নিস্ফল হইয়া একটু নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলাম, সেই সময় Warren সাহেব নিজে আর একটী দল বাঁধিলেন। আমাকে তিনি টানিয়া লইলেন। ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে ১৮৯৯ সালের ২০এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমি Warren Circus এ খেলা দেখাই। এই ১৩।১৪ মাস আমরা আমাদের পুরাতন রঙ্গভূমিতেই আমাদের খেলা দেখাই। সেই চীনের পূর্ব্ব উপকূল, মলয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ও যবদ্বীপ। যবদ্বীপে আমরা দুইটী নূতন জায়গায় যাই কিন্তু বিশেষ কিছু নূতন দেখি নাই। Warren সাহেব বেশ কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে আসিয়া আমার কলিকাতায় ফিরিতে মনটা বড় অস্থির হওয়ায় তাহাদের দল ছাড়িয়া ১৯০০ সালের ১০ই জানুয়ারি কলিকাতায় ফিরি। তিন মাস প্রায় কলিকাতায় বিশ্রাম করি। এই বিশ্রামকালে দৈবক্রমে আমার সহিত এলাহাবাদের 'স্বনাম' ধন্য ৺নীলকমল মিত্র মহাশয়ের পুত্র ৺চারু বাবুর সহিত তাঁহার

বিডনষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেখা হয়। তিনি আমার ব্যায়াম কুশলতার জন্য আমায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করেন আমি Paris প্রদর্শনীতে খেলা দেখাইতে যাইতে পারি কিনা। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম। শুনিলাম এলাহাবাদের বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে হইবে। বাহাদুরজী এলাহাবাদের প্রথিতযশা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর শ্যালক। আমি ৮ই এপ্রিল এলাহাবাদে পৌঁছিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম্ম-জীবনের পুরস্কার

আমি, পান্নালাল বর্দ্ধন ও দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ আমরা তিন জনে এলাহাবাদ ষ্টেশনে যাইয়া বাহাদুরজীর দ্বারা অভ্যর্থিত হই। ৺চারু বাবু আমাদের যাইবার পূর্ব্বেই বাহাদুরজীকে তার করিয়া আমাদের যাত্রার কথা জানাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট একটী বাড়িতে যাইয়া বাসা লইলাম। পরদিন প্রাতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়ীতে আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। পণ্ডিতজী আমাদের সাদরে আপ্যায়িত করিয়া প্যারিস যাইবার বন্দোবস্তের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে ভারতের সকল প্রকার শিল্পীর সমাবেশ তিনি প্যারির বিশ্ব-বিমোহন প্রদর্শনীতে দেখাইতে ইচ্ছা করেন। তবে সময় বড় অল্প। ১০।১৫ দিনের মধ্যে সকল প্রকার যোগাড় হইবে কিনা তাহা তিনি বিবেচনা করিতে বলেন। তাঁহার আগ্রহ, উৎসাহ ও আশান্বিত অবস্থা দেখিয়া আমরাও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য দানে সঙ্কল্প করি। তিনি আমাদের কথা চারু বাবুর নিকট হইতে পূর্ব্বে জানিয়া আমাদিগকে খুব উৎসাহিত করিলেন ও বলিলেন—কতকগুলি লোক এই খান হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং আরও কতকগুলি ইতিমধ্যে যোগাড় করিয়া লইতে হইবে। আমি বাসায় আসিয়া হরিজন্টাল বার খাটাইয়া

আমার খেলার কসরৎ করিতে লাগিলাম। বুঝিয়া লইলাম পৃথিবীর সকলজাতের খেলোয়াড় দলকে আমরা খেলা দেখাইতে হইবে এবং সেই খেলা দেখাইয়া আমার কৃতিত্বের প্রশংসা লাভ করিতে হইবে। এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে আমার যে কেবল অপযশ তাহা নহে, আমায় যাঁহারা অগ্রণী করিয়া পাঠাইতে ছিলেন তাঁহাদের যে কেবল বিফল মনোরথ হওয়া তাহা নহে, আমার দেশের কৃতিত্ব দেখাইবার এমন অবসর যে আর জীবনে পাইব না তাহাও আমার বোধ হইয়াছিল। আমার সহচর পান্নালাল ও দেবেন বেশ বুঝিয়াছিল যে তাহাদেরও জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ। তাহারা দুইজনেও বেশ উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে তৎপরতা দেখাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের বাসায় দুইটী বাঙ্গালী যাদুকর আমাদের পূর্ব্ব হইতেই বাসা লইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা তাহাদের ভোজ বাজীর দুই একটা বাজী আমাদের দেখাইত এবং এইরূপে তাহাদের হাতটী সাফাই রাখিবার চেষ্টা করিত। সেই যৌবনের পূর্ণতার দিনে, শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল বিকাশে, সর্ব্ববিধ সাফল্যের আকুল আহ্বানে, আশার ভরা জোয়ারে যে আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতেছিলাম তাহা বোঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। উদ্দাম উৎসাহের সফলতায় কি যে তৃপ্তি, জীবনব্যাপী আকাঙ্ক্ষার সমুজ্জ্বল আদর্শের ছবির কি যে উন্মাদনা তাহা যিনি জীবনে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কিছু বুঝিতে পারিবেন।

আমরা এইরূপে বাসায় আমোদ আহ্লাদ করিতেছি আর ওদিকে বাহাদুরজী দিনের পর দিন দলটাকে নূতন নূতন লোকের

আমদানি করিয়া ভারি করিয়া তুলিতেছিলেন। আমরা প্রত্যহ বৈকালে পণ্ডিতজীর বৈটকখানায় যাইয়া এই সব সমাচার পাইতাম এবং মধ্যে মধ্যে নবাগত শিল্পীর বিদ্যার পরিচয় পাইতাম। এইরূপ করিয়া আমাদের প্যারি যাত্রীর দল ৬০।৭০ হইল। আমাদের এই ৬০ জনের অনেককেই পণ্ডিতজীর বাড়ীতে আমাদের বিদ্যার মহলা দিতে হইয়াছিল। এবং আপনারা শুনিয়া বোধ হয় খুসী হইবেন যে আমাদের সকলেই নিজের নিজের বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলাম। মহৎ আদর্শের প্রণোদনই বলুন আর বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তির প্রলোভনই বলুন বা উভয়বিধ কারণই হউক আমাদের ধ্যান-ধারণা ও উৎসাহের অবধি ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার কোনও লিখিত স্মারকলিপি নাই যে সমস্ত বিষয় এতদিনে মনে রাখিতে পারি, কিন্তু মনে মনে যাহা একেবারে গাঁথা আছে তাহা কি জীবনে ভোলা যায়? তাই যতদূর মনে পড়ে আমরা এই ৬০ জন কি কি শিল্প বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য সুদূর প্যারিস যাইতেছিলাম তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিব।

আমরা ব্যায়ামকুশলী বা gymnast ছিলাম ৩ জন। পালোয়ান ছিলাম ৮ জন। এই ৮ জনের ভিতর বিখ্যাত গোলাম, কালু ও রোমানি ছিল। যাদুকর ২ জন। বীণবাদক সেতারী ২ জন। এই দুইজনই তাঁহাদের বিদ্যার ওস্তাদ বলিলে কিছুই বলা হয় না, প্রকৃতই তাঁহারা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ। দুইটী বাইজী ছিল একজন তাহার মধ্যে মনে পড়ে দিল্লির গহরজান



মাদাম দেবীর নক-আউটের প্রাক্কাল (৩৫ বৎসর পূর্ব্বে) ৪৮।

Motila Press, Cal.

অপরটী কিঞ্চিৎ অল্প বয়স্কা। সঙ্গে অবশ্য সারঙ্গী, তবলচি, মন্দিরাদার, ছিলিমদার, চিলিমচিদার ও অন্যান্য অনুচর ছিল। দুইজনেই সঙ্গীত বিদুষী। আর গিয়াছিল—

হিন্দুস্থানী হালুইকর, মেওয়ার মিঠাইওয়ালা, ময়রা, কুম্ভকার, কাষ্ঠতক্ষক, ভাস্কর, গজদন্তচিত্রকর, ক্ষৌরকার, সূচিক, সূপকার ও কাশ্মীর নানা প্রকার বস্ত্রশিল্পী। এই সকল কারুর সকল প্রকার যন্ত্র সকলেই আমরা লইয়া যাই। আমরা তিনজন আমাদের হরিজন্টল বার ও অন্যান্য সমস্ত সরঞ্জাম সঙ্গে লই। যাদুকরেরা খেলার আসবাব সব লইয়া যায়। বীণ, সেতার, বাঁয়া, তবলা, সারং, মন্দিরা, ঘুঙুর, হাতা, বেড়ি, ঝাঝরা, খন্তা, চাকি, বেলুন, শিল, নোড়া, কড়া, থাল, ঘটি, বাটি, লোটা, ডিস্, চামচ, ছোরা, ছুরি, বঁটি, কাটারী, কাঁচি সমস্তই আমরা সঙ্গে লইয়াছিলাম। কুম্ভকার তাহার কাজের জন্য চাকা মাটী, কাষ্ঠতক্ষক তাহার বাটালি, ঘিস্‌কাপ, কাঠ পর্য্যন্ত, চিত্রকর তাহার গজদন্ত, ক্ষৌরকার তাহার স্বদেশী ক্ষুর, নরুণ, আয়না, চিরুণী, ভাঁড়, পিঁড়া সমস্ত, সূচিক তাহার সূচ, সূতা, নাটাই, এবং বস্ত্রশিল্পী তাহার তাঁত, মাকু, চিরুণী, জরি এইরূপে সকলে সেখানে যাইয়া যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা বোধ না করিতে হয় এইরূপ সরঞ্জাম লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ হইতে ভাল ঘৃত, তৈল, নানাপ্রকার মসলা, মাটীর হাঁড়ি, ঠোঙ্গার জন্য শালপাতা, হালুইকরের খাবার বিক্রীর বাঁশের ঝুড়ি, তামাক খোরের সকল সরঞ্জাম সমস্তই আমাদের সঙ্গে ছিল।

পণ্ডিতজীর বাড়ীতে শেষাশেষি প্রায় প্রতিদিন ঐ একজন

না একজনের কারুকার্য্যের পরীক্ষা হইত। যে চিত্রকরটী গজদন্তের উপর ছবি তুলিতে জানিত দুইদিনে পণ্ডিতজীর একটী মূর্ত্তি আঁকিয়া দেন। একদিন বৈকালে আমাদের জিমনাষ্টিক খেলার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। একঘণ্টা আমাদের খেলা হয়। আমাদের সহযাত্রী সকলে ত উপস্থিত ছিলেনই, তদ্ব্যতীত পণ্ডিতজীর নিমন্ত্রিত অনেক ভদ্রসন্তান উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই পণ্ডিতজী আমাকে তাঁহার প্রীতিভাজন করিয়া ছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে আমায় এই সমস্ত দলটীকে লইয়া দলপতি ম্যানেজার-স্বরূপ যাইতে হইবে। সেইজন্য তাঁহার বাড়ীতে যে দিন আমার খেলা হইল এবং কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার অভ্যাগত সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিলাম সেদিন বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিয়াছিলাম এবং তাঁহার স্নেহের ও বিশ্বাসের ভার বহনের জন্য আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে পারিয়াছিলাম।

আমাদের যোগাড় চলিতে লাগিল এমন সময় বাহাদুরজী ১০।১২ জনকে লইয়া প্যারিসের জন্য রওনা হইলেন। তিনি দলের অগ্রে যাইলেন আমাদের থাকিবার বাসা ইত্যাদি সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য। আমরা প্রায় ৫০ জন এলাহাবাদ ছাড়ি ২৯এ এপ্রিল। বোম্বাই সহরে একদিন থাকিয়া Imperator নামক জাহাজে আমরা ইউরোপ যাত্রা করিলাম। আমাদের যাত্রার ২।৩ সপ্তাহ পরে পণ্ডিতজীও যাত্রা করেন।

জাহাজে সবই আমার ভার। আমরা কি লগ্নে যাত্রা করি —সমস্ত পথটী কোনও প্রকার ঝড় বৃষ্টি বাদল কিছুই হয় নাই।

খোস গল্পে ও খাওয়া দাওয়ার আমোদে দিনটা কাটিয়া যাইত। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বাইজী দুই জন গান শুনাইত। কেবল যে আমরাই শ্রোতা ছিলাম তাহা নহে জাহাজের সমস্ত আরোহীই তাহাদের গান শুনিতে মজলিসে যোগদান করিত। আমরা ৫০ জন জাহাজের যে অংশে বাস করিতাম সে অংশটী অন্যান্য যাত্রীর ক্যাবিন বা বেড়াইবার স্থান হইতে অনেক বিভিন্ন ও দূরে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রায় সকলেই আসিয়া আমাদের সান্ধ্য বৈঠকে বসিয়া থাকিতে আসিতেন। তাঁহাদের কে কতখানি সঙ্গীতরস উপভোগ করিতেন তাহা বলিতে পারি না, তবে তাঁহাদের যে মন্দ লাগিত না সেটা আমাদের বোধ হইয়াছিল।

এডেনে প্রথম জাহাজ লাগিল। ৫।৬ ঘণ্টায় কেবল কয়লা ও জল লইয়া আবার রওনা হইল। ইহার পর সুয়েজ যাইয়া লঙ্গর করে। এখানে ও ইহার পরবর্ত্তী ষ্টেশন পোর্ট সৈদে এক একবার নামিয়া সহর দুইটী একটু একটু ঘুরিয়া আসি। তথা হইতে Imperator একেবারে ট্রিয়েষ্ট বন্দরে আমাদের নামাইয়া দেয়। Imperator অষ্ট্রিয়ার জাহাজ। তাহার গন্তব্য পথ সেইখানেই শেষ। ১৬ই মে ১৯০০ বুধবার সন্ধ্যাবেলা ইউরোপের ভূমি পদার্পণ করিলাম। ট্রিয়েষ্ট অষ্ট্রিয়ার একটী প্রধান বন্দর। পথ, ঘাট, ঘর বাড়ী, বিজলী বাতি, কলের জল এই সব দেখিয়া বেশ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হইয়াছিল। লোক জন সবাই যে যার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। সহরটী একটী পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। একদিকে সাগর অপর দিকে পর্ব্বতমালা এই দুই এর মধ্যে

তরঙ্গায়িত ভূখণ্ডের উপর সহরটী গড়িয়া উঠিয়াছে। সময়ে সময়ে সহরটীর উপর পর্ব্বতমালার ক্রোড় হইতে একটী প্রচণ্ড ঝটিকা স্রোত নামিয়া আসে তাহা এত বেগবান যে রাস্তা ঘর সেই বায়ুর বেগেই সাফ হইয়া যায়। এমন কি পথিক কেহ সম্মুখে পড়িলে পড়িয়া যায়। সেই ঝটিকা স্রোতের নাম বোয়া। আমরা আমাদের দলের সকলের যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে এত অল্প সময় ট্রিয়েষ্ট ছিলাম যে তথাকার বিখ্যাত ক্যাথিড্রেলটী পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। মিলান ও তুরীনের রেলপথে আমরা প্যারিসে পৌছিলাম। একই গাড়িতে অষ্ট্রিয়া ইটালী ও ফ্রান্সে আমরা যাইতে লাগিলাম। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বিভূতির দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী যাইতেছিল। সব কথা মনে নাই তবে একটা যে বিপর্য্যয় বড় টানেল পার হইতে হইয়াছিল তাহা আজও মনে আছে। দৃশ্যাবলীতে নানা বৈচিত্র দেখিয়াছি, গ্রাম, বন, জঙ্গল, পর্ব্বতমালা, গিরিগহ্বর, নদ, নদী, হ্রদ, কানন, উপবন, সহর সমস্তই পার্শ্বে রাখিয়া আমাদের ট্রেণ ছুটিতেছিল। আমাদের গাড়ী সব reserved ছিল। কি জানি কেন আমাদের এই দুই রাত্রি একদিনের বিদেশীয় রেল গাড়ীতে ভ্রমণে একটু যেন বিশেষ খাতির যত্ন পাইয়াছিলাম। হইতে পারে সেটা আমাদের কালা ভারতবাসীর অদৃষ্টে অভূতপূর্ব্ব বলিয়া একটু বিশেষত্ব বোধ হইয়াছিল, কিম্বা বিদেশী সভ্যতার দ্বারে অতিথি মর্য্যাদা বোধের অভাব একটা ভিন্ন দেশের একদল লোকের নিকট কোনও প্রকারে না প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই এই প্রযত্ন; কিম্বা দুইটী কারণেই ইহা ঘটিয়াছিল। আমি পোষাকে চালে চলনে সব

রকমে ইয়রোপীয় সমাজে অনভ্যস্ত না হইলেও, আমার দলের অনেকেরই পক্ষে স্থান কাল পাত্র সমস্তই নূতন। তাহাদের কৌতূহল, বিস্ময়, আনন্দ ও জিজ্ঞাসা সমস্তই সকলকে দিন রাত অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। বিদেশী রেল কোম্পানির লোক ও বিদেশী পথিক সকলেরই নিকট অজ্ঞাত ভাষার কোলাহলের ও অনভ্যস্ত চেহারার অবোধগম্য কুহেলিকার মধ্যে যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া দিত সেইটুকুই উভয় পক্ষের উপরিলাভ এবং সেটুকুর পরিমাণ ও বড় কম নয়। এইরূপে ১৯শে মে শনিবার আমরা মানুষের হাতে গড়া সকল সৌন্দর্য্যের আগার প্যারি নগরীতে ট্রেণ ছাড়িলাম।

ষ্টেশনে বাহাদুরজী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আমাদের দলটী নামিতেই ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। প্রদর্শনী তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্যারিতে তখন বিস্তর জনতা। সেই জনতার ভিতর আমাদের আগমন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। আমি ইতিপূর্ব্বেই আমাদের দলের সকলকেই নানাপ্রকারে সুসজ্জিত হইতে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমরা নামিলাম ভারতের নানাপ্রকার শিল্পীর বৈচিত্র্যময় পোষাকে। সে পোষাকে বর্ণের বৈচিত্র্য, ছাঁদের বৈচিত্র্য, পরিধান কৌশলের বৈচিত্র্য, শিরস্ত্রাণের বৈচিত্র্য আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাইজী দুই জনের চরণে পায়জের, হস্তে অঙ্গুরী, কেশে ঝাপটা, ও অঙ্গে ওড়না, পেশোয়াজের চুমকি সল্‌মার ঔজ্জ্বল্য ও সোনা রূপা ও মতিমুক্তা হীরার বিচ্ছুরিত প্রভা সেই প্যারিসের বিশ্ব-বিমোহিনী শোভার মধ্যেও এক অভিনব অনুভূতি সকল

দর্শকের নয়নে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। সেই প্রথম দিন হইতেই আমরা এতটা কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলাম যে প্রত্যহই আমাদের প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যাইবার সময় আমাদের সাজসজ্জা দেখিবার জন্য ৫০০।৭০০ শত লোক আমাদের বাসা বাড়ীর পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। বিশ্ব প্রদর্শনীর বিপুল জনসমুদ্র, বিলাস রঙ্গভূমি প্যারি নগরীর অগণিত লীলাতরঙ্গ, রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত নানা বিদেশী ও বিদেশিনীর পারিপাট্য বৈভবের অতুলনীয় সমাবেশ, এবং হাস্য কৌতুক বিস্ময় কৌতূহলের সংমিশ্রণে আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখশ্রীর নয়নদীপ্তির ও চঞ্চল গতি ভঙ্গিমার অনন্ত আনন্দধারা আমাদের সমক্ষে যে নন্দনের শোভা সম্পদ প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিল, আমরাও সেই শোভা সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এই অভিমানে আমরা ধন্য জ্ঞান ও গৌরব বোধ করিয়াছিলাম।

আমাদের বাসা ছিল সিন নদীর অদূরে পুরাতন প্যারির ধারে একটী বড় রাস্তার উপরে। আমাদের বাসা হইতে নদী ৫ মিনিটের পথ। আমাদের বাসার সম্মুখে দক্ষিণে রাস্তাটী ৬০ ফিটের কম চওড়া হইবে না। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটী বিখ্যাত রেস্তরাঁ এবং তাহার দক্ষিণে সিন নদী। নদীটি সেখানে প্রায় ১২০ ফুট চওড়া হইবে। এই সিনের দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল ধরিয়া উভয়কূলে প্রদর্শনীক্ষেত্র। এই প্রদর্শনীক্ষেত্রের এপার ওপার করিবার জন্যই ৫টা পুল ছিল। ঐ দেড় মাইলের অর্দ্ধেকের এক পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট এক একটা

প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে দর্শকের চক্ষে পড়িলেই তত্তৎ দেশের স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়া কোন শক্তির কটক তৎক্ষণাৎ তাহার পরিজ্ঞান জন্মে। এইরূপে ২৫টী বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সমসূত্র বিন্যাসে নদীগর্ভ হইতে এক মায়াজালের ইন্দ্রপুরী উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল প্রাসাদের অপর পারে অর্থাৎ নদীর উত্তর কূলে সভাবাগ ও ফুলওয়ারি এবং ইকনমিক মিউজিয়ম ও পুরাতন প্যারি নগরী সাক্ষীস্বরূপ নদীর কূলে দাঁড়াইয়া আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রাসাদমালার দক্ষিণে প্যারির নাগরিকদিগের পল্লী এবং উত্তরে ও নদীকূলের প্রদর্শনীর ক্ষেত্র ছাড়াইয়াও নাগরিকদিগের বিভিন্ন পল্লী। উত্তর কূলের এই সকল পল্লীর চারি পার্শ্বে অর্থাৎ দক্ষিণের দুই ধারে ও উত্তরের দুই ধারে প্রদর্শনীর বিপুলায়তন বিস্তৃত ক্ষেত্র। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে ভূখণ্ডের উপর পেতিপ্রাসাদ ও কলাভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল ও যাহার পূর্ব্ব কোণে মনুমেন্টেল তোরণ শোভিতেছিল তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬২৫ গজ ও প্রস্থে প্রায় ২২৫ গজ হইবে। এই দুই প্রাসাদের মধ্যে নিকোলাস এভিনিউ নামে প্যারি নগরীর বিখ্যাত রাজপথ। নিকোলাস এভিনিউ দিয়া সেকেন্দর সেতু পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বিশ্বের শ্রমশিল্পের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের মধ্য দিয়াই বিখ্যাত এস্‌প্লানেদ ইনভ্যালিদ বা আরোগ্য পরিক্রমা নামক রাজপথ। এই সমস্ত ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৫০০ গজ ও ৩২০ গজ হইবে। এই প্রাসাদের পশ্চিম ক্রোড় দিয়া ও পূর্ব্বোক্ত প্যারি পল্লীগুলিকে প্রায় ত্রিভূজে বেড়িয়া একটা মুভিং প্লাটফরম বা চলন্ত মঞ্চ ছিল।

প্রদর্শনীর পূর্ব্ব ক্ষেত্র হইতে পশ্চিম ক্ষেত্রে লোক লইয়া যাইবার জন্য এই প্লাটফরম বেলা বারটা অর্থাৎ প্রদর্শনীর আরম্ভ হইতে যত রাত্রি পর্য্যন্ত যে দিন খোলা থাকিত ততক্ষণ দুই মাইলের অধিক পথ অনবরত চলিতে থাকিত। এই প্ল্যাটফরমে তিনটা থাক ছিল। প্রথম থাকটী অল্প বেগে চলিত যাহাতে লোকে যে কোন ষ্টেশন হইতে সহজেই উঠিতে পারে। দ্বিতীয়টী তাহার দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইতে থাকে ও তৃতীয়টী ত্রিগুণ বেগে ছুটিতে থাকে। লোকে প্রথমটী উঠিলেই চলিতে চলিতে দ্বিতীয়টীতে উঠিয়া পড়ে এবং আবার দুই এক নিমেষের মধ্যেই তৃতীয়টীতে উঠিয়া অতি সত্বরে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া যায়। নামিবার সময়ও এইরূপে এক একটী থাক নামিয়া একটী ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেই হইল। এইরূপ ষ্টেশন অত্যল্প দূরে দূরে অবস্থিত ছিল এবং সেই সকল ষ্টেশনে এই প্ল্যাটফরমের টিকিট বিক্রয়ও হইত এবং টিকিট আদায়ও হইত। এই বিরাট ২ মাইল ব্যাপী প্ল্যাটফরম ও টিকিটঘর সমস্তই প্রায় পৃথ্বীতল হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে রেলপথের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষ্টেশনগুলিতেও সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হইত এবং এই প্ল্যাটফরমের নিম্নদেশ দিয়া ট্রাম বাস্ (bus) গাড়ি জনস্রোত নানা পথে যাতায়াত করিতেছে দেখা যাইত।

এই মুভিং প্ল্যাটফরম বা চলন্ত মঞ্চের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্যারি নগরীর বিখ্যাত প্রমোদোদ্যান শম্-দে-মার্স। মার্স রোমানদিগের যুদ্ধ-দেবতা সুতরাং আমরা কার্ত্তিকেয় কানন বা কুমার কানন বলিতে পারি। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ৪৫০ গজ হইবে। এই কুমার-কাননের ভিতরেই প্রদর্শনীর

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত প্রাসাদমালা ছিল এবং এই প্রাসাদমালায় শ্রম-শিল্প, যন্ত্রশিল্প, বৈজ্ঞানিক শিল্পের এত অধিক সম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল যে লোকে দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িত। এই সমস্ত প্রাসাদমালার মধ্যে এক বিস্তৃত সুবিন্যস্ত প্রাঙ্গন ছিল এবং এই প্রাঙ্গনের চতুঃপার্শ্ব বৈদ্যুতিক আলোকমালার স্তবকে সজ্জিত ছিল। প্রাঙ্গনের দক্ষিণদিকে এক কৃত্রিম বৃহদাকার জলাশয় ও তাহার দক্ষিণে তাড়িৎযন্ত্রের প্রদর্শনীর আগার। এই আগারটীর স্থাপত্য সৌন্দর্য্যই বিজলীর মত চক্ষু ঝলসিয়া দেয়। তাহার উপর যেসকল রাত্রিতে সমস্ত আলোকমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইত সে রাত্রিতে প্রাসাদের নানা দিক হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া জলাশয়ের অগণিত ফোয়ারার জলকণার সহিত তাহার অন্তর্দেশ হইতে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির সম্পাতে যেন অলক্ষিত ভাবে অস্পর্শক্ষম অগণিত হীরককণার বৃষ্টিধারাপাতের সৃষ্টি করিত। লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যেন আরব্যোপন্যাসের কোন দৈত্যরাজ্যে চলিয়া যাইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ কোনও হীরক কুড়াইয়া পাইত না ; এইটুকুই সত্য।

এই কুমার-কাননের উত্তর দিকেই বিশ্ববিশ্রুত ইফেলটাওয়ার। সেকেন্দর গস্তেভ ইফেল নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার ১৮৮৯ সালে তাহার ৫৭ বৎসর বয়সের সময় এই বিখ্যাত টাওয়ার নির্ম্মাণ সমাধা করেন। ইহার ৯৮৫ ফুট উচ্চ এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ টাওয়ার। ইহার সমস্তই লৌহ নির্ম্মিত এবং শুনা যায় ৭৫০০ টন লৌহ ইহার নির্ম্মাণে ব্যয়িত হয় ও ২৫০০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড খরচ হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ইহার উপরে উঠা যায়।

উপর হইতে সিন নদী ও প্যারি সহর সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়—অতি ক্ষুদ্রাকার। এমন যে প্যারি ও তাহার এমন যে সৌন্দর্য্য তাহার কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এই ইফেলটাওয়ার আপাদমস্তক যখন আলোকমালায় সাজিয়া উঠিত তাহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এই ইফেল টাওয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আমাদের ক্রীড়া-ভূমির ও আমাদের সর্ব্ববিধ কারুর শিল্প প্রদর্শনের জন্য একটী অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল তুর-দু মন্দ বা ভুবন ভ্রমণ। কিন্তু সে কথা বলিতেছি।—

শম-দি-মার্স বা কুমার-কাননের পরপারে অর্থাৎ প্রদর্শনীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ৬০০ গজ দীর্ঘ ৪০০ গজ প্রস্থ আর একটী উদ্যান ছিল এই উদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি অট্টালিকা ছিল এবং এইসকল অট্টালিকার পশ্চিমে বিখ্যাত ত্রোকাদেরো প্যালেস। এই কাননে পৃথিবীর সকল জাতির রেশমী, পশমী, কার্পাস সূত্র, বস্ত্রশিল্প ও পোষাকের মেলা বসিয়াছিল।

এই যে বিরাট মেলা ক্ষেত্র ইহার সমস্ত বর্ণনা আজ ১৮ বৎসর পরে মনে করিয়া যথাযথ বলিতে পারি এ ক্ষমতা আমার নাই তবে আপনারা যদি মনে করেন যে বেলা ১২টার সময় একখানা টিকিট কিনিয়া সেই দিনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিয়া আসিতে পারিতেন তাহা হইলে আপনারা এই প্রদর্শনীর কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই বা ইহা যে কত বড় ব্যাপারটা ছিল তাহা কোনও কথায় আমিই বুঝাইতে পারি নাই। সমস্ত ক্ষেত্রটী কেবলমাত্র চলিয়া ঘুরিতেই তিন দিনের কষ্ট স্বীকার করিতে

হইত। আর যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া সকল জিনিষ বুঝিয়া দেখিতে হয় তবে ১ মাসেও একটা লোক পারে কিনা সন্দেহ। অথচ যে ছয় মাস এই মেলা চলিতে থাকে প্রত্যহই মেলার সকল পথে লোকের ঠেলাঠেলির অবধি থাকিত না। দুই পা না যাইতে যাইতে এক একটী রেস্তরাঁ; অথচ প্রত্যেক রেস্তঁরায় দলে দলে লোক বসিয়া আহার করিতেছে, পান করিতেছে হাস্য কৌতুক চালাইতেছে। ইহা ছাড়া দর্শকের মধ্যে অনেকে খাবার বাক্সে খাবার সঙ্গে লইয়া মদ পকেটে করিয়া মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিত। বেলা ৪টার সময় কোথাও বেঞ্চে বসিয়া বা দুর্ব্বাদলের উপর বসিয়া জলযোগ সারিয়া লইত। তাহার পর রাত্রি পর্য্যন্ত আবার ঘুরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। মেলা কোনও দিন বা সন্ধ্যার ৮টা কোনও দিন বা রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। নানা প্রকার রঙ্গমঞ্চে কোনও একটা রং তামাসা বা অভিনয়ের আয়োজন থাকিলেই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মেলা খোলা থাকিত। আবার এক একদিন সমস্ত আলোকমালা জ্বালিয়া দীপাবলীর উৎসব হইত। সে রাত্রি প্রাসাদ-চূড়ার বা অলিন্দে অলিন্দে দীপাবলীর ঔজ্জ্বল্য অধিক, কি বিস্ময়াবিষ্ট হর্ষোৎফুল্ল ও আমোদোন্মত্ত নরনারীর নয়নযুগলের ঔজ্জ্বল্য অধিক তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইত। লোকে দুঃখের দারিদ্র্যের আধিব্যাধির বন্যায় আত্মহারা হইয়া যায়—কিন্তু সুখের, সম্পদের, ভোগেরও বিলাসের তরঙ্গের মধ্যেই কি আত্মহারা হয় না! কোথায় আজ সেই প্যারি নগরীর বিলাস সাগরের আহ্লাদের তরঙ্গলীলা ১৯০০ সালের মেলা, আর আজ ১৯১৮ সালের অরাতির কামান গর্জ্জনের

সঙ্গে লোকক্ষয়কারী রণরঙ্গের পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য! সমস্তই স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকা! না আর কিছু আছে?

আমাদের দলের ভারতীয় শিল্পীকুলের প্রদর্শনী ক্ষেত্র যে বাড়ীটীতে স্থান পাইয়াছিল সেটার নাম বলিয়াছি "তুর দ্যু মন্দ" বা ভুবন ভ্রমণ। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ কি ভাবিয়া যে আমাদের ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কারুদিগকে দেখিয়াই দর্শকের পক্ষে ভুবনভ্রমণ সার্থক হইবে ভাবিলেন তাহা আমরা শুনিনাই তবে এটা আমাদের অল্প শ্লাঘার কথা নহে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন "অয়ি ভুবনমনমোহিনি!"

আমাদের "তুর দ্যু মন্দের" মধ্যস্থলে একটী রঙ্গভূমি ছিল। এই রঙ্গভূমিটীর চারিপার্শ্বে নানাপ্রকার সুসজ্জিত দোকান ঘর তৈয়ারি হইয়াছিল। এই সকল দোকান ঘরের এক একটীতে আমাদের এক একজন কারিকর তাহার নিজের নিজের দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল এবং তাহার দোকানের কাজ সকলের সমক্ষে দেখাইত। ইহাদের উপর বাহাদুরজীর আদেশ ছিল যে ঠিক যেমন যে ভাবে ভারতে দোকান চলে ঠিক সেই ভাবেই দোকান চালাইতে হইবে। মনে করুন আমাদের সঙ্গে নাপিতটী তাহার দেশীয় পোঁটলা হইতে কাঠের বাঁটওয়ালা ক্ষুরখানি ধরিয়া ছোট একটী চামড়াখণ্ডে এস্তারাপ করিতেছে, আমাদের আর একজন তাহার সম্মুখে একখানি ইষ্টকের উপর বসিয়া হাতে একখানি টিনমণ্ডিত হংস ডিশের আয়না লইয়া বসিয়া গিয়াছে। হাজাম মহাশয় তাহার পিতলের বাটীটি হইতে জল লইয়া দাড়িতে ঘসিতে লাগিল এবং তাহার ক্ষৌরকার্য্য করিয়া তাহার অঙ্গমর্দন ও

হস্তপদ সেবা করিয়া ছাড়িয়া দিল। লোকে খুব মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা দেখিত। এইরূপ সূচিক চিকনের কাজ করিত। কুম্ভকার তাহার মাটী লইয়া পুতুল গড়িত। বেদিয়া একজন ছিল তাহার মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক ভেল্কি সব দেখাইত। ভাস্কর তাহার শিল্প দেখাইত। বেনারসী শাড়ীর বুটিবোনা দেখান হইত। বাটালির সূক্ষ্ম খোদাইএর কাজ হইত। অনেক সৌখীন বিদেশী বিদেশিনী গজদন্তের উপর তাহাদের মূর্ত্তি আঁকাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এ সকলই দেখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই ভিড় থাকিত। আর লোক জমিত হালুইকর ও ময়রার দোকানে। বিশেষতঃ যখন লুচি বা কচুরি বেলাহইলে কড়ায় পড়িয়া ফুলিয়া উঠিত তখন দর্শকের চক্ষুদুইটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিত ও বদন ব্যাদান করিয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব অবাক্-কাণ্ডের সৃষ্টি করিত। বোধ হয় তাহারা মনে করিত এ সব ভোজবাজী না তাহাদের চক্ষের ভ্রম। কেহ কেহ ক্রয় করিয়া খাইয়া সন্তুষ্ট হইত কেহবা চিবাইয়া ফেলিয়াদিত। কিন্তু তাহাদের বিস্ময়-সূচক স্তব্ধ চাহনি আজও আমার মনে আছে—আর মনে আছে হাসির ফোয়ারার সঙ্গে চোখ টেপাটেপি গা টেপাটেপি ও ঢলিয়া পড়ার আনন্দ। মোটের উপর কিন্তু ভারতীয় খাবার বিক্রয় হইত।

এই সকল দোকান ঘর ছাড়া আমাদের পালোয়ানদের একটা মল্লভূমি ছিল। মল্লভূমির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন ফরাসী উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর ভিতরহইতে যে কোনও লোককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতেন। কোনও দিন বা দুই একজন অগ্রসর হইত

কোনও দিন কেহই আসিত না। যে কেহ আসিত সকলেই আমাদের পালোয়ানদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া যাইত। দর্শকের মধ্যে কেহ অগ্রসর না হইলে এক একজন তাহার যুড়িদারের সঙ্গে কুস্তির নানাপ্রকার কসরৎ দেখাইত। এই কসরৎ দেখাইবার জন্যও বেশ ভিড় হইত।

পালোয়ানেরা ল্যাঙ্গোট কাচ ও গেঞ্জী পরিয়া খেলা দেখাইত। আমাদের বাসায় একদিন স্বনাম ধন্য Eugene Sandow দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের সহিত ও আমাদের পালোয়ানদের সহিত আলাপ করিয়া যান। আমরা অর্থাৎ আমি বাহাদুরজী ও জন ৪।৫ পালোয়ান একদিন Sandowর ক্রীড়াভূমি ক্যাসিনো দে প্যারি (Cassino de Paris) নামক রঙ্গভূমিতে তাঁহার ক্রীড়া দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় দুই ঘন্টা খেলা দেখিয়া আসি। বলা বাহুল্য আমরা টিকিট কিনিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম।

আমাদের পালোয়ানদের প্রধান ছিল গোলাম। গোলামের সহিত বিখ্যাত সুইস পালোয়ান কোয়ার দ আলির সহিত মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। প্যারির বিখ্যাত থিয়েটার হিপোড্রোমে মল্লযুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে ৫০০।৬০০ শত দর্শক। গোলাম যখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল তখন দর্শকগণের মধ্যে এক ভয়ানক কলরব উঠিল এবং মল্লভূমির ধারে সবাই লাফাইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। গোলাম তাহা দেখিয়া কোয়ার দ আলিকে ছাড়িয়া দেয়। এইজন্য নিদ্ধারিত হইল না কাহার জয়। সুতরাং যে ৫০০ শত

পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল তাহা কাহারও প্রাপ্য হইল না। আমাদের দেশের কুস্তির নিয়ম এই যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করিয়া শায়িত করিতে পারিলেই তোমার জিৎ। সে হিসাবে গোলাম জিতিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার নিয়ম এই যে চিৎ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিতে হইবে যতক্ষণ না মধ্যস্থেরা আসিয়া বলিবেন হাঁ তোমার জিৎ হইয়াছে ততক্ষণ তোমার জিৎ নহে তবে তুমি সমান প্রতিদ্বন্দ্বী বটে। যাহাই হউক এই কসরৎ দেখাইয়া বা ইহাতে পুরস্কার না লইয়া গোলামের মর্য্যাদার কোনও হানি হয় নাই। এই ঘটনার পরও তুরঙ্গমনে তাহার কুস্তি দেখিতে যথেষ্ট লোক সমাগম হইত।

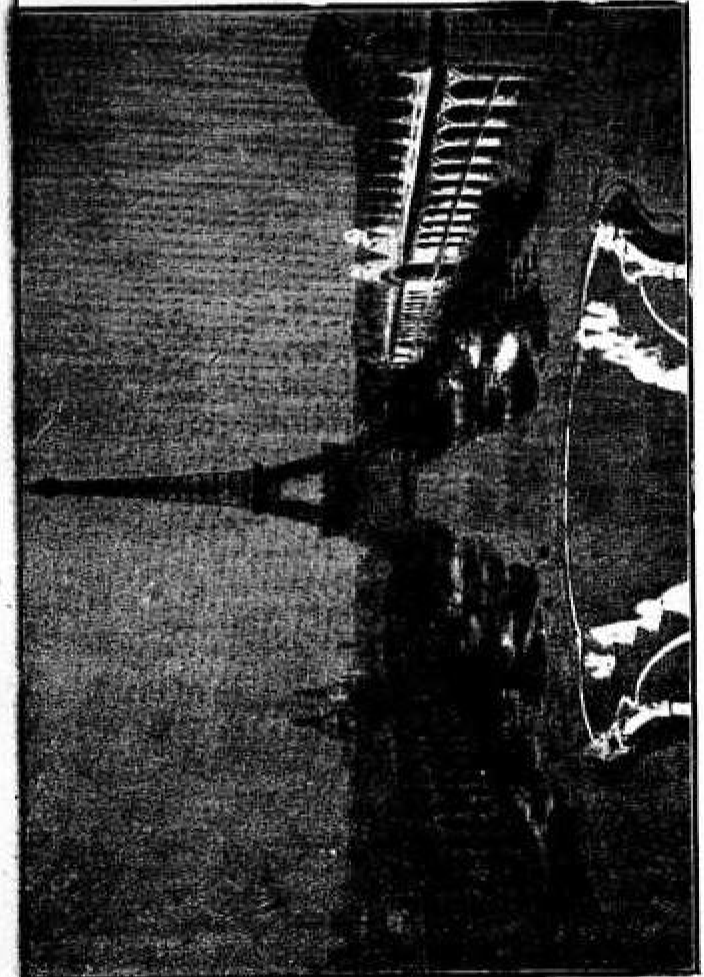
তুরঙ্গমনের কেন্দ্রস্থলে আমাদের রঙ্গভূমি ছিল। তথায় আমরা তিনজন অর্থাৎ আমি পান্নালাল বর্দ্ধন ও দেবেন্দ্র ঘোষ প্রায় প্রত্যহই Triple Horizontal Barএর খেলা দেখাইতাম। আমার বারের খেলা ছাড়া আর একটী খেলা ভিন্ন ভিন্ন Circus দলে থাকিবার কালে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহা Top Spinning বা লাট্টুর খেলা। সে খেলায় নানাপ্রকার হাতের কৌশল দেখান হইত। এখানেও সে খেলা দেখাইতাম। ১৫ মিনিট তাহাতে দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম।

আমাদেরই রঙ্গভূমিতে বীণওয়ালা বীণের মুর্চ্ছনা শোনাইত। সেতারী সেতার আলাপ করিত ও বাইজী দুইজনের নাচ গান হইত। বীণে ও সেতারে প্রত্যহ দুই তিনখানি রাগ রাগিণীর আলাপ শোনান হইত এবং বাইজীরা ২।৩ খানি গান শোনাইয়া ও নাচ দেখাইয়া আসিত। দর্শকবৃন্দ যে কতটা সমজদার ছিল

তাহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে ইহারা যখন কোনও প্রকার গোলমাল না করিয়া ইহাদের অধৈর্য্যের কোনও পরিচয় দেয় না বরং ধীরভাবে শোনে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে আবিষ্ট হইয়া সময় উপলব্ধি করিতে পারে না তখন ইহারা যে মুগ্ধ হয় আকৃষ্ট হয় একটা অশ্রুতপূর্ব্ব বা অননুভূতপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদ লাভ করে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

ইহাই "তুরস্তুমন্দে"র দৃশ্যাবলী। এতদ্ব্যতীত অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে হিন্দুর মন্দির একটী ছোটখাট আকারে গঠিত ছিল, চীনের প্যাগোডাও একটী ছিল, মুসলমানী মস্‌জীদের মিনারও একটী ছিল তবে খ্রীষ্টানি গির্জ্জা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সকল প্রকার স্থাপত্য শিল্পের সংমিশ্রণে বসুমতীর সকল জাতির সমবায়ে ও ভারতের শিল্পচাতুর্য্যের ও কলাকৌশলের সম্মিলনে তুর-দু-মন্দের নামের সার্থকতা কতটা হইয়াছিল তাহা সেই বিরাট প্রদর্শনী রঙ্গভূমির একটী ক্ষুদ্র অভিনেতা আমি আজ দেড় যুগ পরে কি করিয়া বলিব? বোধহয় আমার সে কথা বলিবার চেষ্টাও ধৃষ্টতা।

তিন মাস ধরিয়া আমরা এই বিশ্বপ্রদর্শনীর অভিনেতা ছিলাম। অবসরক্রমে এক একদিন বাহাদুরজীর সহিত ইউরোপের বিলাস-বিভ্রমময়ী প্যারি নগরী দেখিতে যাইতাম। দিনের মধ্যে যাহাদের কাজকর্ম্মে বড় ব্যস্ত-সমস্ত পরিশ্রমী নাগরিক দেখিতাম রাত্রে তাহারাই সুসজ্জিত বিলাসবেশে অন্য মূর্ত্তি ধরিয়া রঙ্গিনী বা অন্য মহিলার সঙ্গে "বুফেতে" বা পানাগারে পান করিতে মত্ত। দিনের



প্যারিস নগরের একটি দৃশ্য।

অর্জ্জন রাত্রের বিলাসে ব্যয়িত। অপব্যয়িত কি না তাহাও বিচার্য্য, কেননা যেখানে সমস্ত সহরটাই দিনে একরূপ ও রাত্রে অন্যরূপ, দিনে কর্ম্মী রাত্রে ভোগী, দিনে চিন্তিত রাত্রে মোহমুগ্ধ, দিনে যে জীবন শক্তি-সংক্ষুব্ধ, ক্ষমতা চঞ্চলিত ও উদ্যম উৎসাহ দ্বারা দেহ মন ঐকান্তিকতায় অনুপ্রাণিত, রাত্রে সেই জীবন অলসভাবে নিশ্চেষ্ট-ভাবে বিস্মৃতির আরামে কামনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে উন্মুখ। ইহাই প্যারি বাসীর জীবন, ইহাই তাহাদের দৈনন্দিন নিত্য ঘটনা। তাহাতে অর্থের ব্যয় অপব্যয় বা সদ্ব্যয় খতাইয়া দেখিবার বা বিচার করিবার অবসরই বা কোথায়—তৌলদণ্ডই বা কি? তবে রাত্রের প্যারি নাগরিক প্রকৃতই বিশ্বপ্রেমিক; তাহার উদারতাই বা কি আর তাহার সহৃদয়তাই বা কি! সেই প্রদর্শনীর বিশ্বজনতার সকলের সহিতই তাহার হৃদয়ের অতি নিকটসম্বন্ধ আছে, কেহ তাহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত হয় তাহার সৌজন্য আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করে এই ভয়েই যেন ব্যস্ত। দিনে কিন্তু সে অন্য প্রাণী অন্য মানুষ। দিনে সে কেবল কেরাণী কর্ম্মী তাহার কর্ম্ম-কলের নির্দ্দিষ্ট চাকাটী যথাস্থানে থাকিয়া ঘুরিতে পারিলেই হইল। দিনের পৃথিবী তাহার নিকট একটী বিরাট কলবাড়ীর কারখানা। রাত্রের প্যারিনগরী তাহার নিকট মানুষের মহা মিলনক্ষেত্র। হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে বাসনার বিনিময়ে একটা যেন প্রমোদোদ্যানের আনন্দউৎস। আমার নিকট যেটুকু ঠেকিয়াছিল তাহা বলিলাম। ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আমাদের প্রত্যাগমনের সময় দলের জন ৮ থাকিয়া গেলেন পরে ফিরিবেন মনস্থ ছিল। এই ৮ জনের মধ্যে গজদন্তের

৬

উপর চিত্র আঁকিতে জানিতেন যে শিল্পী তিনিও একজন। তিনি তাহার নিজের কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ গোটাকয়েক চিত্র অঙ্কিত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সমাধা না করিয়া আর কি করিয়া ফেরেন। আমরা সকলে ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্যারি ত্যাগ করিয়া ১৮ই তারিখে জেনোয়া বন্দরে আসি—১৯শে তারিখে রোমে আসি। কিছুক্ষণ রোমে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল সেইজন্য একবার খানিকটা ঘুরিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম। রোমের বিরাট বিরাট অট্টালিকা প্রাসাদ ও গির্জ্জা একদিন কি একমাসেও ভাল করিয়া দেখা যায় না কিন্তু আমাদের সময়াভাব। তাড়াতাড়ি দলটীকে গুছাইয়া লইয়া সেই দিনই নেপলস যাত্রা করি। তথায়ও নামমাত্র সহরটা ঘুরিয়া আসি। বিদেশী বলিয়া এক একবার অধিবাসীদিগের নয়ন আকর্ষণ করিতাম এবং আবার আমরা অগ্রসর হইতে থাকিতাম। নেপলসেই আমরা জাহাজে চড়ি এবং তথা হইতে মেসিনা, পোর্টসৈয়দ, সুয়েজ, এডেন হইয়া ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বোম্বাই সহরে পৌছিয়া আমাদের দলটীকে বিদায় দিলাম। বিদায় দিবার সময় আমাদের বিগত কয়মাসের সম্মিলন কিরূপ প্রীতির ও আমোদ আহ্লাদের সহিত কাটিয়াছিল তাহা সকলেরই মনে পড়িতে লাগিল। কর্ম্মক্ষেত্রের সাফল্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আবার কষ্ট, আয়াস, বিফলতা, সব জড়াইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে যে সামান্ত সুখ সৌভাগ্য মানুষের অদৃষ্টে সাধারণতঃ লেখা থাকে, আমাদের প্যারির বিশ্বপ্রদর্শনীর যাত্রার মতন আহ্লাদ ও আনন্দের সৌভাগ্য আমাদের শুভাদৃষ্টে যাহা

ঘটিয়াছিল তাহার জন্য ভাগ্যবিধাতাই আমাদের ধন্যবাদার্হ, সেই-জন্যই আমার আজও মনে হয় আমার কর্ম্মজীবনের এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০০ সালে শুক্রবার সন্ধ্যার সময় বোম্বাই মেলে কলিকাতায় পৌছিলাম। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, বাল্য সখা সকলের নিকট আমার এই দূর প্রবাসের কাহিনী বড়ই প্রীতিকর লাগিয়াছিল। কিছু দিন বাড়িতে বসিয়া বিশ্রাম ভোগ করিতে লাগিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

কর্ম্মজীবনের পরিণতি

তিন মাস না যাইতেই যাইতেই আবার কর্ম্মের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। সেই সময় আমার পুরাতন বন্ধু Abel সাহেব কলিকাতায় ছিলেন। তিনি আমায় উৎসাহিত করিলেন। আমাদের আর একজন বাঙ্গালী সমব্যবসায়ী শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসাক অর্থ সাহায্যে উৎসাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। Abel সাহেবের হাতে তখন ৫টী টাট্টু ২।৩টী বাঁদর শিখান ছিল। Fred West, Florie West বলিয়া দুইজন ভ্রাতাভগ্নী Circusএ খেলা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল Neven দম্পতী নামে আরো দুইজন খেলোয়ার কলিকাতায় ছিলেন। আমি ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে দলপতি হইয়া অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বতোষ বসু একজন বেশ উৎসাহী খেলোয়ার অগ্রণী হইয়া আসিলেন। ভূতনাথ বসু নামে আর একজন সুকৌশলী মাহুত ছিলেন তিনিও আমার দলে যোগদান করিলেন। ফণি বলিয়া আর একটী ছোকরা ঘোড়ার উপর খেলা দেখাইবার জন্য যোগদান করিলেন। কয়েকজন মুসলমান কনসার্টওয়ালা আমাদের দলের বাজনা বাজাইবার ভার গ্রহণ করে। আমি সাহসে ভর দিয়া আরো কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক কর্ম্মচারী লইয়া টাকার মায়া না করিয়া ১৯০১ সালে ছোট দিনের পরদিন কলিকাতার

ময়দানে Great Eastern Circus নাম দিয়া খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রেট ইষ্টার্ণ সার্কাসই ৩।৪ বৎসর পরে Hippodrome হিপোড্রাম নামে ভারতবর্ষে পরিচিত হইয়াছিল। প্রথম বৎসর পরেই শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসাকের সহিত আমার হিসাব নিকাশ হইয়া আমিই একমাত্র সত্বাধিকারী হইয়া এই সার্কাস ১৪ বৎসর ধরিয়া চালাইয়া আসিয়াছি। আমার এই দলে মহারাষ্ট্রবাসী, মহীশূরী, পেশোয়ারী, ময়লা নাম, তৈলঙ্গী, রুমেনিয়ান্, স্পেনবাসী, ফিলিপিনো, জার্ম্মান, অষ্ট্রেলিয়ান, মার্কিন, ইংরাজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, রুস, মুসলমান, মলয়বাসী, চীনা, জাপানী সকল প্রকার লোক আসিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আজ তাঁহারা কেহ আমার নিকট নাই তথাপি আমি তাঁহাদের কাহাকেও ভুলি নাই এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমার নিকট তাঁহারা কেহ এমন কোনও ব্যবহার পান নাই যে তাঁহারাও আমায় ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। আমার সার্কাস পৃথিবীর সকল জাতির জগন্নাথক্ষেত্র ছিল; আমি সেই ক্ষেত্রের পড়িহারী (প্রতিহারী) স্বরূপ কতটা দায়িত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছি সে বিচার ভার আমি আজ নিশ্চিন্ত মনে তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি। যদি লোকক্ষয়কারী রণরঙ্গে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী তাণ্ডবনৃত্য নাচিয়া না উঠিত, যদি মানুষই মানুষের প্রধান শত্রু এই বিকট নীতির সর্ব্বধ্বংসী লীলা মানবসমাজ বিধ্বস্ত করিতে না থাকিত তবে আজও আমার দলটী অটুট থাকিতে পারিত। আমিও আমার দলের বন্ধু-বান্ধবের সহিত মানব-সাধারণের অবসর বিনোদন করিয়া বিচরণ

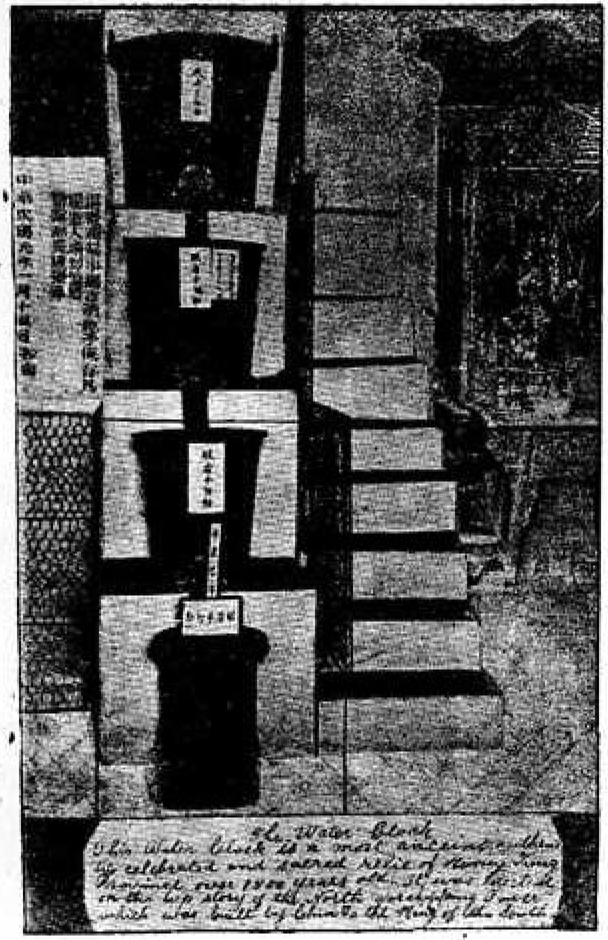
করিতে পারিতাম কিন্তু এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধের পর আমার দল ভাঙ্গিতে হইয়াছিল।

এই ১৪ বৎসরের ইতিহাসে আমায় ব্যবসার খাতিরে কিছু অধিকতর বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইত। প্রত্যেক নূতন আয়গায় যাইলেই তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা শুনা করা, তাঁবু খাটান, বাসা ঠিক করা, হোটেল ঠিক করা, বিজ্ঞাপনের যোগাড় করা, স্থানীয় লোকজনের সাহায্যের যোগাড় করা এই সকল কার্য্যে আমায় এতটা ব্যস্ত থাকিতে হইত যে নূতন স্থানের নূতন দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়া মনোপটে আঁকিয়া লইতে পারি নাই। নূতন স্থানে যাইয়া নূতন যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিতে অবশ্য অবহেলা করিতাম না। কিন্তু আজ আমি সে সব বিষয় যথাযথ স্মরণ পথে আনিতে পারিতেছি না বলিয়াই এই সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ কিছু দিতে পারিলাম না। দিতে পারিলে পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম। কিন্তু এত জায়গায় গিয়াছি ও এত প্রকারের বিভিন্ন দৃশ্য দেখিয়াছি এবং সে সকল এত বিভিন্ন প্রকারের মনের অবস্থার মধ্যে ঘটিয়াছে যে তাহা কেবল মনের সিন্দুক খুলিয়া বাহির করা অসম্ভব। যখন যে জায়গায় যাহা দেখিয়াছি তাহা যদি একখানি ছোট বইএ টুকিয়া রাখিতাম আজ এই মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইত না। সাধারণভাবে স্থানগুলির বর্ণনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। সেইজন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া আপনাদের নিকট প্রথমে বলি এই চৌদ্দ বৎসরে কোন কোন নগরে কোন কোন তারিখে গিয়াছিলাম

ও পরে সেই সেই স্থলের কয়েকটী উল্লেখ করিয়া আপনাদের কৌতূহল যথা সম্ভব চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।—

কলিকাতা	২।১।১৯০১		হাবড়া	১৯।১২।১৯০২	
হাবড়া	৩০।১	"	খড়্গপুর	৭।১	"
চন্দননগর	১৯।২	"	মেদিনীপুর	১৩।১	"
রাণীগঞ্জ	২৬।২	"	বালেশ্বর	২০।১	"
আসনসোল	২।৩	"	কটক	২৪।১	"
জামালপুর	৮।৩	"	বহরমপুর (গঞ্জাম)	৩।২	"
বাঁকিপুর	১৪।৩	"	বিজয়নগরম্	৮।২	"
দানাপুর	১৮।৩	"	বিশাখাপত্তন	১৪।২	"
বারাণসী	২৩।৩	"	কোকনদ	২০।২	"
ফৈজাবাদ	২৮।৩	"	রাজমহেন্দ্রী	২৪।২	"
লক্ষ্ণৌ	৩।৪	"	বেজওয়াদা	১।৩	"
কাণপুর	১৫।৪	"	নেলোর	৭।৩	"
ঝাঁসী	২২।৪	"	মাদ্রাজ	১১।৩	"
আগরা	২৯।৪	"	কুদাপ্পা	২১।৩	"
মীরাট	৯।৫	"	আদোনি	২৭।৩	"
রুড়কি	১৭।৫	"	(রায়চূড়ের পথে)		
আম্বালা	২০।৫	"	রায়চূড়	১।৪	"
অমৃতসহর	২৫।৫	"	(নিজাম রাজ্য)		
লাহোর	২৯।৫	"	শোলাপুর	৫।৪	"
রাওয়ল পিণ্ডি	১১।৬	"	পুনা	১১।৪	"

পেশওয়ার	২১।৬।১৯০১	কার্কি	১৭।৪।১৯০২
নৌশেরা	১।৭ "	(পুনার নিকটে)	
কাম্পবেলপুর	৫।৭ "	লানৌলি	২১।৪ "
মুলতান	১০।৭ "	(পুনা হইতে থানার বাথে)	
শকর	১৮।৭ "	আমেদনগর	২৫।৪ "
কোয়েতা	২২।৭ "	ভুসোয়াল	১।৫ "
শিকার পুর	১২।৮ "	মৌ	৬।৫ "
হায়দরাবাদ (সিন্ধু)	১৯।৮ "	ইন্দোর	১৪।৫ "
করাচী	২৬।৮ "	নীমচ	২৪।৫ "
বোম্বাই	১।১০ "	নসিরাবাদ	২৯।৫ "
পুনা	৩০।১০ "	আজমীর	২।৬ "
আমেদনগর	৪।১১ "	আগরা	৭।৬ "
ভুসোয়াল	১৩।১১ "	দিল্লী	১৬।৬ "
অমরাবতী	১৫।১১ "	মীরাট	২৩।৬ "
কাম্পতি	২০।১১ "	সাহারান পুর	৩০।৬ "
নাগপুর	২৫।১১ "	ডেরাডুন	৩।৭ "
বিলাসপুর	৩।১২ "	রুড়কি	১১।৭ "
পুরুলিয়া	৭।১২ "	আম্বালা	১৪।৭ "
আসনসোল	১১।১২ "	জলন্ধর	২১।৭ "
লাহোর	২৪।৭ "	শিয়ালকোট	৩১।৭ "
রাওয়াল পিণ্ডি	৭।৮ "	পেশোয়ার	১৮।৮ "
নৌশেরা	২৮।৮ "	কাম্পবেলপুর	১।৯ "
		ঝিলম	৫।৯ "



কণ্টিণ নগরের জলঘড়ী

(এখনও বর্ত্তমান)

মিয়ানমীর	৮।৯।১৯০১	আজমীর	১৮।৬।১৯০২
ফিরোজপুর	১৫।৯।১৯০২	মথুরা	২৫।৬ "
লাহোর	২২।৯ "	আগরা	২৯।৬ "
আম্বালা	৩০।৯ "	কাণপুর	৬।৭ "
রুড়কি	৬।১০ "	এলাহাবাদ	১৩।৭ "
মোরাদাবাদ	১০।১০ "	বারাণশী	২০।৭ "
বেরেলি	১৩।১০ "	ফৈজাবাদ	২৮।৭ "
লক্ষ্ণৌ	২১।১০ "	লক্ষ্ণৌ	৩।৮ "
ফৈজাবাদ	৩০।১০ "	বেরেলি	১৫।৮ "
বারাণশী	৩।১১ "	মোরাদাবাদ	২৪।৮ "
দানাপুর	১১।১১ "	দিল্লী	২৯।৮ "
জামালপুর	১৭।১১ "	মীরাট	১২।৯ "
কলিকাতা	২৬।১১ "	সাহারাণপুর	১৮।৯ "
মেদিনীপুর	২০।১২ "	ডেরাডুন	২১।৯ "
কটক	৩।১।১৯০৩	রুড়কি	২৮।৯ "
বহরমপুর (গঞ্জাম)	১০।১ "	আম্বালা	৫।১০ "
বিজয়নগরম্	১৪।১ "	লুধিয়ানা	১২।১০ "
বিশাখপত্তন	১৮।১ "	লাহোর	১৬।১০ "
কোকনদ	২৪।১ "	শিয়ালকোট	২৬।১০ "
রাজমহেন্দ্রী	৩০।১ "	রাওয়ালপিণ্ডি	৩।১১ "
এলোর	৫।২ "	ঝিলম্	১৩।১১ "
বেজওয়াদা	৯।২ "	মিয়ানমীর	১৮।১১ "
ওয়ারাঙ্গল	১৪।২ "	মুলতান	২৪।১১ "

সেকন্দরাবাদ	১৯।২।১৯০৩	শক্কর	২।১২।১৯০২
ত্রিমুলগড়ি	২৬।২ "	হায়দরাবাদ (সিন্ধু)	৮।১২ "
(সেকন্দরাবাদের নিকট)		করাচী	১৫।১২ "
হায়দরাবাদ (নিজাম)	৬।৩ "	কলম্বো	২৪।১।১৯০৪
গুলবর্গা	২১।৩ "	মাত্রা	৮।২ "
শোলাপুর	২৭।৩ "	গল	১২।২ "
পুনা	১।৪ "	কালুতারা	১৯।২ "
কার্কি	১৩।৪ "	কাণ্ডি	২২।২ "
লানৌলি	১৮।৪ "	কুর্ণিনল	২৯।২ "
ইগাতপুরী	২৪।৪ "	নিগম্বো	৯।৩ "
(কল্যান হইতে নাসিকের পথে)		চিলাও	১৬।৩ "
নাসিক	২৭।৪ "	মারাভিলা	২১।৩ "
ভুসোয়াল	৫।৫ "	নিগম্বো	২৮।৩ "
খাণ্ডোয়া	৯।৫ "	তুতিকোরিণ	৩।৪ "
হার্দ্দা	১৪।৫ "	মাদুরা	১৮।৪ "
মৌ	১৯।৫ "	ত্রিচিনপল্লী	২৫।৪ "
ইন্দোর	২৫।৫ "	তাঞ্জোর	২৫।৪ "
রৎনাম	৫।৬ "	পণ্ডিচেরী	৭।৫ "
নীমচ	৮।৬ "	নসিরাবাদ	১২।৩ "
		(আজমীরের সন্নিকটে)	
মাদ্রাজ	১২।৫ "	পুনা	২৩।৯ "
বাঙ্গালোর	২৭।৫ "	কার্কি	৫।১০ "
মহীশূর	২০।৬ "	আমেদনগর	৯।১০ "

বাঙ্গালোর	৬।৭।১: ০৩	ভুসোয়াল	১৭।১০।১৯০২
বেলারী	১৯।৭ "	খাণ্ডোয়া	২৩।১০ "
হুবলী (জংশন)	১।৮ "	মৌ	৩১।১০ "
বেলগ্রাম	৮।৮ "	ইন্দোর	৯।১১ "
কোলাপুর	১৬।৮ "	আমেদাবাদ	২৭।১১ "
পুনা	২৪।৮ "	বরোদা	৪।১২ "
শোলাপুর	৩০।৮ "	বোম্বাই	১৪।১২ "
সেকেন্দরাবাদ	৭।৯ "	কলম্বো	১১।১।১৯০৬
ত্রিমূলগড়ী	১৯।৯ "	গল	২৬।১ "
হায়দরাবাদ (নিজাম)	২৬।৯ "	মাত্রা	১।২ "
ওয়ারাঙ্গল	১৭।১০ "	কালুতারা	৫।২ "
বেজওয়াদা	২১।১০ "	কাণ্ডি	১০।২ "
এলোর	২৭।১০ "	মাতালে	২০।২ "
রাজমহেন্দ্রী	৩১।১০ "	কুর্ণীগল	২৪।২ "
কোকনদ	৭।১১ "	জাফনা	৬।৩ "
বিশাখাপত্তন	১৫।৩১ "	কলম্বো	২১।৩ "
নেলোর	২৩।১১ "	তুতিকোরিন	৩০।৩ "
মাদ্রাজ	২৯।১১ "	তিনেভেলি	৬।৪ "
কলম্বো	২৬।১২ "	মাদুরা	১২।৪ "
কুর্ণীগল	১০।১ ১৯০৫	ত্রিচিনপল্লী	১৯।৪ "
কাণ্ডি	২০।১ "	সালেম	২৭।৪ "
গল	৩১।১ "	বাঙ্গালোর	৩।৫ "
মাত্রা	৬।২ "	মহীশূর	২৯।৫।১৯০৬

কালুতারা	১৩।২।১৯০৫	উড়িগ্রাম	১৮।৬।১৯০৬
তুতীকোরিন	১৭।২ "	মাদ্রাজ	২৫।৬ "
মাদুরা	২৫।২ "	নেলোর	১৭।৭ "
ত্রিচিনপল্লী	২৭।২ "	বেজওয়াদা	২৪।৭ "
কয়ম্বাটুর	৭।৩ "	সেকেন্দরাবাদ	৩০।৭ "
কালিকট	১৩।৩ "	ত্রিমুলগড়ী	৯।৮ "
কানানোর	২৪।৩ "	গুলবর্গা	২০।৮ "
তেলিচেরী	১।৪ "	শোলাপুর	২৫।৮ "
পালঘাট	৭।৪ "	আমেদনগর	৩১।৮ "
(কয়ম্বাটুরের নিকট)		ভুসোয়ালে	৮।৯ "
সালেম	১৪।৪ "	খাণ্ডোয়া	১০।৯ "
বাঙ্গালোর	২২।৪ "	হার্দা	২৭।৯ "
মহীশূর	৩১।৫ "	জব্বলপুর	২৪।৯ "
বেলারী	২৩।৬ "	সাগর	৬।১০ "
রায়চুড়	১১।৭ "	ঝাঁসী	১২।১০ "
সেকেন্দরাবাদ	২০।৭ "	কাণপুর	১৮।১০ "
ত্রিমুলগড়ী	৭।৮ "	এলাহাবাদ	২৭।১০ "
হায়দরাবাদ (নিজাম)	১৪।৮ "	বারাণসী	৯।১১ "
গুলবর্গা	১৭।৯ "	মাঙ্গালোর	১৮।১
দানাপুর	১৪।১১।১৯০৬	কালিকর্ত্ত	৩১।৩ "
আসানসোল	১০।১১ "	আর্ণাকুলম্	৮।৪ "
কলিকাতা	২৯।১১ "	(পশ্চিম উপকূলে)	

বর্মা		ত্রিচুড়	১৮।৪।১৯০৬
রেঙ্গুন	১০।১।১৯০৭	(আর্ণাকুলমের পথে)	
তৌঙ্গো	২৫।১ "	পালঘাট	২৫।৪ "
পেগু	৩১।১ "	সালেম	২।৫ "
প্রোম	৫।২ "	উড়িগ্রাম	৯।৫ "
পোংডে	১১।২ "	বাঙ্গালোর	১৬।৫ "
লাটপাদান	১৫।২ "	মহীশূর	৬।৬ "
ইন্‌সিন্	২০।২ "	বেলারি	২৪।৬ "
মৌলমিন	১।৩ "	রায়চুড়	৮।৭ "
——			
পিনাং	১৯।৩ "	সেকেন্দরাবাদ	২৬।৭ "
মিদান	২।৪ "	ত্রিমুলগড়ী	২৭।৭ "
সিঙ্গাপুর	১৭।৪ "	হায়দরাবাদ (নিজাম)	৪।৮ "
যবদ্বীপ			
বাটাভিয়া	১৪।৫ "	গুলবর্গা	২৫।৮ "
বাইটেনজর্গ	১২।৬ "	পুনা	২।৯ "
শুকভূমি	১৮।৬ "	আমেদনগর	২৪।৯ "
তাঞ্জোর	২৪।৬ "	ভুসোয়াল	২৯।৯ "
বাঞ্চুং	২৮।৬ "	খাণ্ডোয়া	৬।১০ "
গারুট	৯।৭ "	হার্দা	১০।১০ "
তাসিকমালয়	১৩।৭ "	জব্বলপুর	১৬।১০ "
তিলালজাপ	১৮।৭ "	এলাহাবাদ	২।১১ "
জোকজা	২৮।৭ "	দানাপুর	১৩।১১ "

সুরবায়া	২।৮।১৯০৭	আসানসোল	২০।১১।১৯০৮
যোজোকর্তো	১৬।৮ „	কলিকাতা	১।১২ „
পাসোরোঁয়া	২০।৮ „	রেঙ্গুন	২১।১।১৯০৯
মালাং	২৪।৮ „	পিনাং	১৬।২ „
কেদেরি	৩১।৮ „	সিঙ্গাপুর	২।৩ „
সোলো	৫।৯ „	সায়গণ	২২।৩ „
সামারাং	১১।৯ „	হংকং	২৮।৪ „
সিঙ্গাপুর	২।১০ „		

জাপান।

কলম্বো	১৯।১০ „	কোবে	২৩।৫ „
কাণ্ডি	৫।১১ „	ওসাকা	১০।৬ „
মাতালে	১১।১১ „	কিয়োটো	৭।৭ „
কুর্ণীগল	১৬।১১ „	নাগোয়া	১৮।৭ „
বোম্বাই	৩০।১১ „	টৌকিও	৩০।৭ „
মাদ্রাজ	২৮।১২ „	ইয়কোহামা	১৯।৮ „

পণ্ডিচেরি	১৪।১।১৯০৮	শাংঘাই	১৩।৯ „
কডালোর	২০।১ „	মানিলা	২২।১০ „
কুম্ভকোনম্	২৫।১ „	হংকং	১৬।১১ „
নেগাপত্তন	৩১।১ „	ব্যাঙ্কক্	৮।১২ „
তাঞ্জোর	৫।২ „	সিঙ্গাপুর	২৫।১।১৯১০
ত্রিচিনপল্লী	১১।২ „	পিনাং	১৬।২ „
কয়ম্বাটুর	১৯।২ „	মিদান	৪।৩ „

কালিকট্ট	২৮।২।১৯০৮	ইপো	২।৪।১৯১০
তেলিচেরি	৯।৩ „	কুয়ালালমপুর	১৩।৪ „

কোচিন চায়না

সায়গণ	১৩।৫।১৯১০	কুয়ালালমপুর	১।৬ „
হায়কোঁ	৮।৬ „	ক্ল্যাং	১৩।৬ „
হানয়	১৭।৬ „	সেরাম্বান	১৯।৬ „
হংকং	৫।৭ „	মলকা	২৪।৬ „

শাংঘাই	২০।৭ „	বাটাভিয়া	১২।৭ „
শিংটাউ	১০।৮ „	বাণ্ডুং	৫।৮ „
টিন্টসিন	২৩।৮ „	জোদজা	১৬।৮ „
পিকিন	১৪।৯ „	সুরবায়া	২০।৮ „
ঐ (হাতামানফটক)	৪।১০ „	যোজো কর্তো	১১।৯ „
শাংঘাই	২৩।১০ „	মালাং	১৭।৯ „
সিংগাপুর	১৬।১১ „	কেদেরি	২৪।৯ „
রেঙ্গুন	৩০।১১ „	জোম্বাং	৩০।৯ „
কলম্বো	৪।১।১৯১১	সোলো	৪।১০ „
নিগম্বো	২৩।১ „	সিঙ্গাপুর	২৬।১০ „
ওয়াইকল	৩০।১ „	মাদ্রাজ	১৫।১১ „
কণ্ডি	৪।২ „	কলিকাতা	১৪।১২ „
কুর্ণীগল	২১।২ „	কলম্বো	১০।২।১৯১৩
জাফনা	৩।৩ „	মাত্রা	৩।৩ „
অনুরাধাপুরা	১৬।৩ „	গল	১০।৩ „

(কোচিন চায়না)

গল	২১।৩।১৯১১	কালুতারা	১৭।৩।১৯১৩
কালুতারা	২৭।৩ "	মাতালে	৩১।৩ "
কলম্বো	১।৪ "	নিগম্বো	৭।৪ "
সায়গন	৫।৫ "	কলম্বো	১৪।৪ "
হানয়	৬।৬ "	সায়গন	৫।৫ "
মান্দিন্	২১।৬ "	হংকং	২।৬ "
		ক্যাণ্টন	২।৭ "
হংকং	৫।৭ "	সিঙ্গাপুর	৯।৮ "
সিঙ্গাপুর	৮।৯ "	সেরেম্বান	২৬।৮ "
পিনাং	৩।১৯ "	কুয়ালা লমপুর	২।৯ "
মিদান	১৬।১০ "	ক্ল্যাং	১৫।৯ "
রেঙ্গুন	১৬।১১ "	ইপো	২৩;৯ "

সিংহল

কলম্বো	২০।১২ "	তারপিং	৩০।৯ "
নিগম্বো	১৬।১।১৯১২	মিদান	৭।১০ "
কাণ্ডি	২৭।১ "	পিনাং	২২।১০ "
মাতালে	৯।২ "	রেঙ্গুন	৫।১১ "
কুর্ণীগল	১২।২ "	কলিকাতা	২।১২ "
মাতালে	২৪।২ "	কলম্বো	৩১।১।১৯১৪
গাম্পোলা	১।৩ "	সিঙ্গাপুর	১৮।৩ "
মাত্রা	১৯।৩ "	ব্যাংকক	৯।৪ "
গল	২৫।৩ "	হংকং	৯।৫ "

সিংহল

কালুতারা	১১।৪ "	শাংঘাই	১৩।৬ "
মরতুয়া	১৮।৪ "	শিংটাউ	১১।৭ "
পিনাং	৩০।৪ "	তারপিং	১১।৫ "
ইপো	১৮।৫ "	কাম্বার	২৭।৫ "
টিণ্টসিন	২১।৭ "	পিকিন	১১।৮ "
টিণ্টসিন	২৯।৮ "	কোবে	২১।৯ "
ওসাকা	৮।১০ "	টোকিও	৯।১১ "
ইয়কোহামা	৫।১২ "	টোকিও	২৬।১২ "
শাংঘাই	১৭।২।১৯১৫	হুচাও	১০।৩ "
চিকিয়াং	২৪।৩ "	হ্যানকাউ	১২।৪ "
সিঙ্গাপুর	২৭।৫ "	জহোর	৭।৬ "
মলক্কা	১২।৬ "	সেরেম্বান	১৭।৬ "
কুয়ালালমপুর	২৪।৬ "	ক্ল্যাং	২।৭ "
ইপো	১৩।৭ "	তারপিং	২১।৭ "
পারটবন্টর	২৭।৭ "	পিনাং	৩।৮ "
মিডান	১৪।৪ "	কাসারান	২।৯ "
বিঞ্জি	৪।৯ "		

ক্ল্যাং হইতে আমি কলিকাতায় আসি। যুদ্ধের জন্য তৎপূর্ব্ব হইতেই আমাদের উপার্জ্জন মন্দা পড়িয়া আসিতেছিল। প্রত্যহ ৩০০।৪০০ শত টাকা খরচ যোগাইয়া দল বাঁধিয়ারাখা অসম্ভব হওয়াতে আমি কলিকাতা হইতে দল ভাঙ্গিবার জন্য তার করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই আমার দলের জর্ম্মান কয়জন শাংঘাই

সহরে আশ্রয় লইয়াছিল কারণ শাংঘাই free port। লোকের সার্কাসের খেলা দেখিবার আগ্রহও কমিয়া যাইতেছিল। সেইজন্য বিল্পিতেই আমাদের কাজ গুটাইতে হয়। তদবধি কলিকাতায় কয়েক বৎসর কাটাইয়াছি।

আমার এই ১৪ বৎসরের ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। সে সকল কথা সাধারণ পাঠকের ভাল না লাগিতে পারে, তবে দুই-চারিটী নিজেদের কথা আপনারা বোধ হয় ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িবেন।

ইহাও অবশ্য বলা বাহুল্য যে যখন যেখানে যাইতাম তথাকার ইতিহাসিক কীর্ত্তিকলাপ দেখিতাম বৈ কি! আগ্রায় যাইয়া তাজমহল না দেখিয়া কি আসিয়াছি! না দিল্লী যাইয়া মোগল রাজ-প্রাসাদমালা ও কুতবমিনার না দেখিয়াছি! সে সকল কথা অন্যান্য অনেক ভ্রমণকারীর বর্ণনায় আপনারা পড়িয়াছেন। অন্য অনেকের যে সকল দেশ দেখা ঘটিয়া উঠে না তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

আমাদের দলবল লইয়া প্রথম যখন বিজয়নগরে যাই তথাকার প্রসিদ্ধ পালোয়ান রামমূর্ত্তির সহিত আমাদের আলাপ হয়। বিজয়নগর রামমূর্ত্তির জন্মভূমি। আজ তিনি ভারতবর্ষের একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার সম্মানের জন্য আমরা একদিন আমাদের খেলা দেখাই। সেইদিন হইতে আজও তাঁহার সহিত আমার সমান প্রীতিরভাব বর্ত্তমান আছে বিজয়নগর অবস্থান-কালে মহারাজা বাহাদুরও আমাদের একদিন রাজপ্রাসাদে ক্রীড়া প্রদর্শণের জন্য আহ্বান করেন।

মহীশূরে যে কয়বার যাই কয়বারই মহারাজা বাহাদুরের রাজপ্রাসাদে আমরা ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য আহূত হই। এ সম্মান ও তাহার সঙ্গে যে সকল উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলাম তাহা আমার সারাজীবনের গৌরবের সামগ্রী। দুইবার তাঁহার নিকট হইতে দুইটী হস্তী লাভ করিয়াছিলাম।

যে কয়বারই আমরা যাই আমরা মহারাজার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতে দেখি। আজকাল শুনিয়াছি নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে। স্থাপত্য শিল্পের সুবিন্যাস এত সুন্দর যে মাদ্রাজ ও দক্ষিণের অন্যান্য স্থানের পুরাতন শিল্প নিদর্শণের সহিত মহীশূরের রাজ্যের নূতন প্রাসাদ না দেখিয়া আসিলে ভারতের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

সকল দেশেই আমাদের ক্রীড়াস্থানের জন্য জমির ভাড়াস্বরূপ কিছু না কিছু দিতে হইয়াছে। কিন্তু যে কয়বার নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদ গিয়াছি ভাড়া দিতে হয় নাই। ১৯০৪।৫ শালে সেনাপতি আফসরজঙ্গ বাহাদুর তাঁহার প্রাসাদ তুল্য ভবনে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। সে আদর যত্ন আপ্যায়ণ আমরণ আমার স্মৃতিপথে আঁকা থাকিবে।

উড়িগ্রাম কোলার সুবর্ণখনির সন্নিকটে। তথায় থাকাকালে কোনারে আমাদের ক্রীড়া দেখিবার জন্য আলাহিদা বন্দোবস্ত হয়। কোল্হাপুর অবস্থান কালে রাজপ্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

এই ১৪ বৎসরের ১২ বৎসর কাল আমরা দিনের দিন উন্নতি

লাভ করিয়াছিলাম। ১৯০২ সালের সুরু হইতে আমার দলে বরাবরই নূতন নূতন ক্রীড়া কৌশলী আসিয়া যোগদান করিয়াছে। এমনকি ১৯১৩ শালের আগষ্ট মাসে সিঙ্গাপুর থাকার সময় একেবারে ছয়জন শিল্পী যোগদান করে। ১৯১২ শালের শেষভাগে যখন কলিকাতায় আসি তখন আমি বারটী খুঁটীর তাঁবু খাটাইয়াছিলাম। আমার সার্কাস জীবনে আমি অপর সার্কাসে দুইটী খুঁটির অধিক বৃহত্তর তাঁবু দেখি নাই। ১৯০৯ সাল হইতে যে কয়বার হংকং গিয়াছি আমরা একটা করিয়া কাঠের রঙ্গভূমি তৈয়ার করাইয়া লইতাম ও আসিবার সময় ছাড়িয়া দিয়া আসিতাম। আমাদের যখন খুব রমরমা, তখন আমাদের দলবল ১০০ জন লোক, তিনটী সিংহ, দুইটী বাঘ, একটী হায়না, একটী লেপার্ড, একটী জলহস্তী, তিনটী হস্তী, কুড়িটী অশ্ব, তিনটী বাঁদর ও একটী জেব্রা। ইহাদের সকলের প্রাত্যাহিক আহার বিহার শয়ন পরিচর্য্যা পোষাক সমস্তই আমাদের তত্বাবধানে চলিত। আমার অধীনে যে কয়জন কর্ম্মচারী এই তত্বাবধানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। এ কয়জনই আজও বাঁচিয়া আছেন।

তবে মানুষের অদৃষ্টে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সৌভাগ্য কি থাকে? এই ১৪ বৎসরের মধ্যে দুর্ঘটনাও নানাপ্রকার হইয়া গিয়াছে। আমাদের স্বজনবিয়োগও ঘটিয়াছে। আমার এই জীবনের প্রধান প্রবর্ত্তক ও সহায় এবেল সাহেব ১৯১৩ সালের ১২ই অক্টোবর পিনাং সহরে মারা যান। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৩ বৎসর। ২২শে অক্টোবর আমরা পিনাং যাইয়া তাঁহার

স্মৃতির সম্মানে তাঁহার গোরস্থানে একটী মর্ম্মর প্রস্তরের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া আসি।

আমার প্যারিসের সহযাত্রী ও বন্ধু দেবেন্দ্র ঘোষ একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। আমরা শক্করে থাকার সময় দেবেন্দ্রবাবুর আহার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে এমন সময় সংবাদ আসিল সিন্ধু নদে স্নান করিতে করিতে দেবেন্দ্রবাবুকে আর পাওয়া যাইতেছে না। আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা শক্কর ত্যাগ করি। লোক ঠিক করিয়া যাই যদি তাহার শবদেহ ভাসিয়া উঠে তবে তাহার খবর যেন তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে খবরও আর পাই নাই।

এতদ্ব্যতীত বন্যজন্তু লইয়া আমাদের ঘর করিতে হইত। আমাদের দলের কাহাকেও তজ্জন্য কোনও বিপদে পড়িতে না হইলেও অপরকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে। তবে ততটা সাঙ্ঘাতিক নহে। দুইবার হাতী মরিয়া যায়। একবার জাহাজেই সমুদ্রপথে। হাতীর মৃতদেহ ক্রেণে করিয়া সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর একবার সায়গণে লবণপূর্ণ গহ্বরে প্রোথিত করিতে হয়। লবণ দিয়া হস্তীদেহ পুতিয়া ফেলিলে গজাস্থির উদ্ধার শীঘ্রই হয় এবং গজাস্থি দ্বারা নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য হয়। সুমাত্রা ডেলিতে একটা সিংহ মারা যায়। সিংহচর্ম্মটা স্থানীয় লোকে ছাড়াইয়া লয়। একবার সেকেন্দ্রাবাদে ও একবার বাটাভিয়ায় তাঁবু উড়িয়া যায়, সালেমে একবার তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া দেয়। তথাকার কতগুলি তকমাধারী লোক দলবদ্ধ

হইয়া তক্‌মার জোরে প্রবেশপ্রার্থী হয়। আমাদের সহিত তজ্জন্য কিঞ্চিৎ বচসা হয় এবং আমরা বসিতে স্থান দিই নাই। তাহার পরই ঐ অগ্নিকাণ্ড হয়।

ইতিপূর্ব্বে ম্যানিলার ঝড়ের কথা লিখিয়াছি। একদিন খেলার প্রাক্কালে typhoon বা ঘূর্ণীবাতাস হইবে ঘোষণা দেওয়া হইল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁবু গুটাইয়া ভগবানের আকাশের আবরণে ক্রীড়া দেখাই। ইহা আমাদের এক নূতনতর ব্যাপার।

বলা বাহুল্য যে অসুখ-বিসুখ যে ছিল না তাহা নহে। তবে মোটের উপর সকলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুখী ছিলাম।

১৯১৪ সালে যখন টোকিও সহরে আমাদের খেলা চলিতেছিল তখন বর্ত্তমান মহাসমর বাধিয়া গিয়াছে। সিংটাও যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মাণদিগের উপনিবেশ ছিল। ৭ই নভেম্বর জাপানীগণ অবাধে বিনা যুদ্ধে শিংটাও সহরটী করগত করে। এখন অবশ্য উহা জাপানী সহর। সিংটাওএর সমুদ্রকূল খুব বিস্তৃত সেইজন্য এসিয়ার পূর্ব্বদিকে সিংটাও গ্রীষ্মাবাস ও স্নানার্থীর মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

আমাদের ভ্রমণস্থানের ফর্দটী দেখিলেই বুঝিবেন আমরা সুদূর জাপানে দুইবার গিয়াছিলাম। বহু পূর্ব্বে যখন জাপানে গিয়াছিলাম সে জাপান আর নাই। রুষিয়াকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়াই হউক বা তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতিবলেই হউক এখন জাপান সভ্য শক্তিসমূহের একজন। ইহার পূর্ব্বে যখন জাপানে আসিয়াছিলাম তখন নিজেরাই সকল যোগাড় করিয়া লইয়া খেলা দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৯ সালে যখন ওসাকায় পদার্পণ

করিলাম তখন আমাদের খেলা দেখাইবার ভার চুক্তি করিয়া একজন জাপানী লইলেন। জাপানের পয়সা জাপানীর হাত দিয়া কুড়াইতে হইয়াছিল।

সেবার মনে পড়ে ওসাকা সহরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। উহাতে অধিকাংশ সহরই প্রায় ভস্ম হইয়া যায়। আমরা আমাদের একদিনের ক্রীড়ার সমস্ত আয় ঐ সময় গৃহদাহ ক্ষতিপূরণে প্রদান করি। আমাদের এ প্রকারের দান অনেক স্থলে অনেকবার করিতে হইয়াছে, কোন প্রকারে সেটাকে আমরা লোকসান মনে করিতে পারি না। আমার বাঙ্গালীর প্রাণে এ প্রকারের অনুরোধ কখনই উপেক্ষণীয় হয় নাই এবং আশা করি আমাদের জাতীয় চরিত্র ও সমবেদনা বোধ বোধ হয় কখনই লুপ্ত হইবে না।

চীনে যাই তিনবার। প্রত্যেক বারেই আমরা এক একজন সম্ভ্রান্ত ধনী চীনাকে আমাদের টিকিট বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করি। ভাষা বুঝিবার জন্য ও বোঝাইবার জন্য বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনের জন্য দোভাষীও রাখিতে হইত। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে আমরা সম্ভ্রান্ত চীনেদের ঘরে নিমন্ত্রণ লাভ করিতাম। আমাদের জন্য নাচের আয়োজন হইত। আমরা অবশ্য ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, তবে একটা যে লয় আছে তাহা বোঝা যাইত। বাজনার সুরের সঙ্গে ও ঢোলকের তালের সঙ্গে গায়িকার কণ্ঠস্বর মিলাইবার ও অঙ্গভঙ্গি ফুটাইবার চেষ্টা বুঝিতে পারা যাইত। সুরের জন্য যাহা বাজান হইত তাহা একটী একতারা, কিন্তু এসরাজের মতন ছড়ি দ্বারা তাহা হইতে সুর বাহির করা হয়। আওয়াজটা বেহালারই মতন কিন্তু

বেহালা অপেক্ষা অনেক উচ্চ গ্রামে সুর বাঁধা। ঢোলকটী তলা খোলা বড় বাঁয়া বা কাড়ার মতন কাটি দ্বারা বাজান হয়।

কিছুক্ষণ বসিবার পর আমরা আহারের জন্য টেবিলে যাইয়া বসিলাম। প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী করিয়া কাচের ছোট ডিস সাজান। সেইটাকে খাবার পাত্র ধরিয়া লউন। তাহার পরে বড় ডিসে করিয়া ৪।৫ রকম মাছের খাবার আসিল। ৪।৫ রকমের আস্বাদন। ছোট মাছগুলি আস্ত বড় মাছগুলি টুকরা করা। তাহার পর হাঁসের মাংস, মুরগির মাংস, শূকরের মাংস সব বিভিন্ন প্রকারের রন্ধন বিদ্যার পরিচায়ক। শূকরের মাংস চীনেদের নিত্য ব্যবহার্য্য। সঙ্গে বরাবর আর একটী ডিসে ভাত থাকে। আমরা এইরূপে ৪০।৫০ রকমের আহার্য্য খাইয়াছি। মিষ্টান্ন চীনে নাই বলিলেই হয়। তবে ভাতের পিটের মতন এক রকম জিনিষ তৈয়ারী খাইয়াছি তাহাকে মিষ্টান্ন বলিলেও বলা যায়। চীনে দুধ কোনও প্রকার দেখি নাই। গরু দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

একবার আমরা চীনেদের পর্ব্বোৎসব দেখিয়াছি। বাড়ী ঘর সমস্ত কাগজ ও রঙ্গীন কাপড়ে সাজান হয়। অধিবাসীরা নূতন পোষাক পরে এবং পথে শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রায় বাজনা বাজান হয়, চীনা সানাই বাজে, নানা প্রকার ফলফুলের ডালা সাজান থাকে আর থাকে শূকরের মাংস। এক একটা আস্ত শূকরের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া সিদ্ধ করিয়া একটী টেবিলে করিয়া লইয়া যায়। এই রকম শোভাযাত্রা চলিয়া যাইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা আমরা দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি।



জাপান দেশীয় আগ্নেয় পর্বত (ফুজিয়ামা)

Mohila Press, Cal.

চীনে যখন শেষবার যাই তখন আমরা তিনটী সহরে গিয়াছিলাম। আমার বোধ হয় অতি অল্প সংখ্যক বৈদেশিকই ঐ তিনটী চিনা সহর দেখিয়াছেন। তিনটীর মধ্যে সুচাও ও চিকিয়াংএর রাস্তাগুলি কাশীর গলিকে মনে করাইয়া দেয়। কাশীতে বড়রাস্তাও আছে সরু গলিও আছে কিন্তু এই দুইটী সহরেই সমস্তই এই রকম সরু গলিতে কাজ চলে। ইহার উপর আবার মধ্যে মধ্যে কাটা খালের পথ আছে। জোয়ারের সময় সেই সকল কাটা খালের ভিতর জল আসিলে ফিরিওয়ালারা ডিঙ্গি করিয়া সেই খাল বাহিয়া তাহাদের পণ্যভাণ্ডার লোকের খিড়কী দরজায় দরজায় বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। আমাদের পক্ষে ঐ সহর দেখাও যেমন নূতন লাগিয়াছিল, আমাদের দেখাও তেমনি উহাদের পক্ষে এক নূতন অভিজ্ঞতা দিয়াছিল।

হ্যাংকাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সহর এবং রাস্তা ঘাটও চওড়া এবং অনকরেক বৈদেশিক বণিকও ব্যবসা করে।

১৯১৩ সালে ক্যান্টন যাই। ক্যান্টন ইউরোপীয়দিগের আড্ডা, —একটী দ্বীপ। একটী ছোট পুল দিয়া চীনা সহরে যাইতে হয়। এখানে রাস্তা বড় সরু। একখানি sedan chairএ বসিয়া যদি পথ ভ্রমণে যাওয়া যায় তবে পদাতিক পথিককে কাত হইয়া পথের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে আর যাইবার উপায় নাই। কি জানি কেন ক্যান্টনবাসী বৈদেশিকের সহিত বড় ভয়ে ভয়ে ব্যবহার করে, কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিবার পর বা কিছুক্ষণের ব্যবহারের পর তাহারা নির্ভয় হয়। আমাদেরও প্রথম প্রথম ভয় হইত লোকগুলা কি রকম। কোনও কিছু

গোলমাল বাধায় না, কিন্তু পরে দেখিলাম অতি নিরীহ লোক। ক্যান্টনে চীনা জীবনের ও চীনা সভ্যতার সকল নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মন্দির বা প্যাগোডা অনেক আছে। আর দেখিয়াছি চীনা জলঘড়ি। ক্রমান্বয়ে চারিটী লোহ নির্ম্মিত জলপূর্ণ পাত্র সাজান আছে। প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তৃতীয়টী তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও চতুর্থটী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। প্রথম হইতে দ্বিতীয়টীতে পড়ে ও দ্বিতীয়টী হইতে তৃতীয়টীতে ও তৃতীয়টী হইতে চতুর্থটীতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িবার এক একটী পাইপ আছে। কেবল চতুর্থটীতে একটী মাপ-কাটা আছে জলের উচ্চতা ধরিয়া সময়ের নিরূপণ হয়। বিলাতী ঘণ্টা মিনিটের পরিবর্ত্তে যেমন আমাদের দণ্ড পল বিপল অনুপল আছে চীনেদেরও সেই প্রকার কিছু একটা আছে তবে সেটা শিখিবার বড় একটা সুবিধা হয় নাই। সেটা অনুস্বরের অবোধগম্যতার দরুণ।

চীন জাপানের পথে বর্ম্মা ও মলয় দ্বীপপুঞ্জ হইয়া যাইতাম তাহা বলা বাহুল্য। এ সকল সহর প্রায় একই রকম তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

সিংহলে সাতবার গিয়াছিলাম। আধুনিক সহরের কথা আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয়। তাহাতে নূতন আর কি লিখিব। অনুরাধাপুরের কথা স্বতন্ত্র। কতকালের পুরাতন রাস্তা তাহার দুই ধারে কত প্রাচীন কালের মন্দির-মালা। কাশীর মন্দিরমালা দেখিয়াছি তথায় মন্দিরে ফুল

বিল্বপত্র গঙ্গাজল আছেই। কিন্তু অনুরাধাপুরের মন্দিরে পূজক নাই। তবে এখনও কোথাও কোথাও পুরোহিত আছে। মন্ত্রমুগ্ধ মন্দির দেবতা সবই যেন কিসের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

আমার ফর্দ্দে দেখিবেন আমরা প্রায় ছয় বার ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি। জীবনে এ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মনে করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারি। ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ, অগণিত নগরী, অসংখ্য গৃহমালা, অনন্ত জন স্রোত, অফুরন্ত বৈচিত্র্য এই দেশের প্রাণ। কত রং, কত পোষাক, কত ফল ফুল, তরবেতর শাকসবজী তরিতরকারি। কত ভিন্ন আচার ব্যবহার, কত বিভিন্ন ভাষা, কত রকম বেরকম প্রাকৃতিক ছবি। গরম, ঠাণ্ডা, বর্ষা, বসন্ত সবঋতুর সব রকম ভূভাগ। ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেত, সরিষার ফুল, অড়হরের গুল্ম চারিদিকে রেলপথের সূক্ষ্ম ধারাকে বেড়িয়া আছে। আম কাঁঠালের বাগান হইতে পাইন বা ইউক্যালিপ্‌টাসের সারি পর্য্যন্ত সকল রকম বনস্পতিতে সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত। ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিণী হইতে বিশালবক্ষা নদী পর্য্যন্ত সকল প্রকার জললীলায় এই ভূমি সদা সর্ব্বদা ক্রীড়ারত ভীষণ হিংস্রক শ্বাপদ হইতে মানুষের ক্রীড়া-সঙ্গী গরু, ছাগল পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রাণীর আশ্রয় ভূমি। শবমাংসাশী হাড়গিলা শকুনি হইতে টুনটুনি ফিঙ্গে পর্য্যন্ত নানাপ্রকার পক্ষীজাতি বনে, উপবনে ও পালকের গৃহ প্রাঙ্গনে উড়িতেছে, বসিতেছে, খেলা করিতেছে। ইহার উপর রাজরাজোয়ারার ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে দরিদ্র ভিক্ষুকের দীনতা পাশাপাশি স্থান করিয়া লইয়াছে।

এই যে রকমের অন্ত নাই, বিভিন্নতার বিরোধ নাই, সকলেই সকলের ঠাঁই দিতেছে, সবই থাকিতে পারে, সকল প্রকার বৈচিত্র্যই শোভা পায়, ইহাই বোধ হয় আমার ভারতবর্ষ দেখার প্রধানতম অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষ-ভ্রমণকারী অনেকেই অনেক রকম দেখিয়াছেন কিন্তু আমি এইটুকুই আপনাদের বলিতে পারিলাম আর কিছু পারিলাম না। এ ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

চীনেরা আমাদের খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। সভ্যতার বাহ্য অবয়বের সৌষ্ঠবে চীনে সহরগুলি বোধ হয় খুব একটা উচ্চ স্তরে অবস্থিত। হয়ত ভারতবর্ষের সহরগুলি ঠিক ততটা নহে। জাপান হয়ত সেই সৌষ্ঠব আধুনিক শোভনতায় শোভন করিয়া তুলিয়াছে এবং হয়ত ইউরোপের নগরের সহিত পাল্লা দিতে পারে। ভারতের আধুনিক নগরগুলিও হয়ত ততটা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ও শোভন নহে। যবদ্বীপে আমাদের আয় হয়ত ডোলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল এবং হয়ত তাহারা আমাদের খেলা বুঝিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ হইয়াছিল। হয়ত ভারতবাসী দর্শকবৃন্দ ততটা বুঝিয়া দেখে না বা দেখিতে অবসর পায় না। কিন্তু তথাপি ভারতের রকমই ভারতের সকল কাজের মধ্যে কিছু না কিছু সার্থকতা আনিয়া দেয়। আমরা বেশ জানি অন্য দেশে দু-একদিন যাহা বোঝা যায় ভারতবর্ষে তাহা বুঝিতে অধিক দিন লাগে। কেননা এ দেশে একদল লোকের যাহা ভাল না লাগে অপর লোকের তাহা লাগিয়া যায়। সকল দেশের রকম-সকম চাল-চলন একই রকম। এদেশের চালচলন রকম নানাপ্রকারের।

প্যারিতে "ভুবন ভ্রমণ" (তুর-দু-মনে) আমরা খেলা করিয়াছিলাম। প্যারি প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলে যে "ভুবন-ভ্রমণ" করিবার সাধ মিটাইতে পারেন আমার তাহা এক একবার মনে হয়। অনেকে নাকি বলেন ভারতবর্ষের বিভিন্নতাই ভারতের দুর্ব্বলতা। তাঁহারা কতটা ভাবিয়া বা কি বুঝিয়া বলেন আমি সে বিচার করিতে অপারগ। আমার এই দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া যে ভাবটা মনে জাগিয়াছে তাহাই কেবল বলিতে পারি। এসিয়ার ক্রোড়ে ৩০ বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্যারির অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনীর বিশ্বজনতা দেখিয়া ও নানাদেশীয় নরনারীর সম্মিলনের যোগভূমি কোথায় তাহা ঘটাইতে পারিয়া আমার মনে হয় ভারতবর্ষের নানা জাতির নানা বর্ণের নানা স্বার্থের সমবায়ই ভারতবর্ষের প্রাণ। এই প্রাণ-শক্তি দুর্ব্বল কি সবল তাহার বিচার করিবার ভার যিনি মিলাইয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। এই মিলনক্ষেত্রের ক্রীড়াভূমি ভারতবর্ষেরই ক্রোড়।